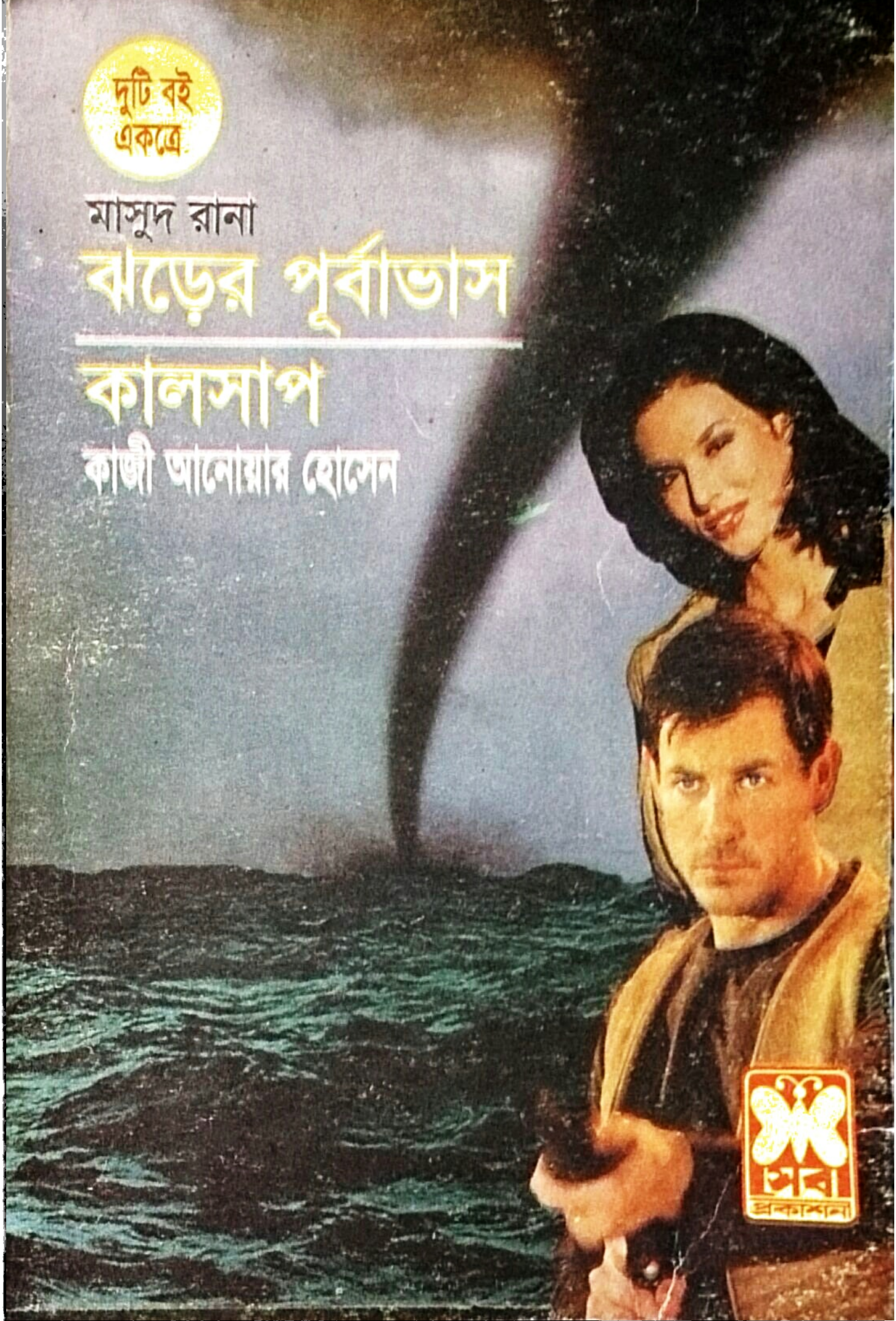

দুটি বই একত্রে
মাসুদ রানা
ঝড়ের পূর্বাভাস
কালসাপ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী

ঝড়ের পূর্বাভাস

নতুন দেশে বেড়াতে এসে বিপদে জড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা- একদিক থেকে বিদ্রোহী বাহিনী সরকার উৎখাত করতে আসছে, অন্যদিক থেকে আসছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রচন্ড হারিকেন। বিশ্বাস করেনা মানুষ। শেষ পর্যন্ত সত্যিই এল হারিকেন 'ম্যাবেল', শুরু হয়ে গেল আঠারো ঘন্টার তান্ডব। তার সঙ্গে আরেক নাটক।

কালসাপ

সবুজাভ রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল ম্যাশেটির ফলা, থ্যাচ্ করে একটা শব্দ হলো। লগের একপাশে ছিটকে পড়ল গাইডের মাথা। মালয়েশিয়ার গভীর অরন্যে গেরিলা লিডার দাতো সোলায়মানের ক্যাম্প। সিআইএ কর্মকর্তা অ্যালান বোর্ডারের নির্দেশে গাইডসহ মাসুদ রানাকে এক রকম ফাঁদ পেতেই ধরা হয়েছে। একটু দেরিতে হলেও, ওর গাইডের মত খুন করা হবে ওকেও।

মাসুদ রানা

ঝড়ের পূর্বাভাস

কালসাপ

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7629-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
IHADER PURBABHASH
KALSHAP
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা
প্রকাশনা

পঁয়ষট্টি টাকা

১২১

কালসাপ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

জানালার ধারে বসে শেষ বিকেলের প্লেন জার্নিটা উপভোগ করছে মাসুদ রানা। কুয়ালালামপুর থেকে কোটা বারু প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, মাঝখানে দুশো কিলোমিটারই হয় দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, নয়তো দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল। পাহাড়গুলো এক থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু, কোনটাই ন্যাড়া নয়, ঘন সবুজ গাছপালায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঢাকা। পাহাড় ও জঙ্গলে আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছোটখাট গ্রাম আছে, সেসব প্লেন থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। ম্যাপেও সেগুলো দেখানো হয়নি, কারণ অনেক গ্রামে এখনও কোন সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। তবে সমতল উপত্যকায় রাবার বাগানগুলো পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে ও। মনে পড়ল, বাংলাদেশী শ্রমিকরা এই বাগানগুলোতেই হাড়ভাঙা শ্রম দেয়।

কুয়ালালামপুরে রানা এজেন্সির শাখা আছে, মালয়েশিয়ান বন্ধু আবু রাশেদের পরামর্শে কোটা বারুতে এজেন্সির দ্বিতীয় শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। সমস্ত প্রস্তুতি আগেই সম্পন্ন হয়েছে, আজ শুভ উদ্বোধন।

কোটা বারু আধুনিক শহর, কয়েক লক্ষ লোকের বাস। লোক সংখ্যার তুলনায় অপরাধের হার বেশি হওয়ায় আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পুলিস বিভাগ, এমন কি মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্সও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইন্টেলিজেন্স ও পুলিস বিভাগের কর্মকর্তারা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থাকবেন। রানা জানে, এজেন্সির এজেন্ট ও কর্মচারীদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের আবু রাশেদও থাকবে। গতকাল কুয়ালালামপুরে টেলিফোন করে রানাকে কথা দিয়েছে সে।

রাশেদ রানার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের বেশ কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। সম্পর্কটা তুই-তোকারির, দেখা হলে কেউই পরস্পরকে সহজে ছাড় দেয় না। বিয়ে করেনি, রানার মতই কনফার্মড্ ব্যাচেলর। দু'জনের পেশাও এক। রানার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই মেলে, বন্ধুত্বটা গভীর হবার সেটাও অন্যতম কারণ। দেশপ্রেমের অনেক কঠিন পরীক্ষায় তাকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে দেখেছে রানা। এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ঢুকে হতাশ হতে হলো ওকে। রাশেদ আসেনি। এজেন্সির নতুন শাখায় যারা কাজ করবে তাদের মধ্যে বাঙালী তো আছেই, মালয়েশিয়ানও আছে কয়েকজন। রানার প্রশ্নের উত্তরে কেউ তারা বলতে পারল না রাশেদ কেন আসেনি। অভিমান বা দুঃখ নয়, বরং একটু অবাকই লাগছে ওর। কথা দিয়ে না রাখার পাত্র তো সে নয়। না আসার অনেক কারণ

থাকতে পারে, কিন্তু একটা টেলিফোন করে অপারগতার কথাটা জানায়নি কেন? অশুভ চিন্তাটাই আগে জাগে মানুষের মনে, রানা ভাবল রাশেদের কোন বিপদ ঘটেনি তো?

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সন্ধে ছ'টায়। এখন বাজে পাঁচটা। রাশেদকে অফিসে পাওয়া যাবে না, তাই এয়ারপোর্ট থেকেই তার বাড়িতে ফোন করল রানা। অপরপ্রান্তে, মেইড-সার্ভেন্ট রিসিভার তুলল, সে শুধু জানাতে পারল, সাহেব বলে গেছেন ফিরতে তাঁর আজ দেরি হবে। কানেকশন কেটে দিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, ভাবল রাশেদের অফিসে ফোন করবে কিনা। না, ইন্টেলিজেন্স অফিসে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ করা উচিত নয়। তারচেয়ে অপেক্ষা করবে সে–এয়ারপোর্টে আসেনি, অনুষ্ঠানে ঠিকই হাজির হবে ব্যাটা।

জালান টুক হাকিম আর জালান সুলতানা জয়নাব, এই দুই রাস্তার চৌমাথায় রানা এজেন্সির নতুন শাখা অফিস, বিশাল ও অভিজাত একটা শপিং মল-এর ঠিক পাশেই। মালয়ী বা ম্যালেই ভাষায় জালান অর্থ রাস্তা। জালান পোস্ট অফিস লামা শপিং মল থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে, ওই রাস্তার পাশেই রাশেদের অফিস। এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও রাশেদ তো নয়ই, মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কোন কর্মকর্তাও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসেননি। ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা না করলেও, মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছে রানা। অবশ্য অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন ঘটল না, সব কিছু সুচারুভাবেই সম্পন্ন হলো। একজন প্রতিমন্ত্রী ফিতে কাটলেন, পুলিস কর্মকর্তাদের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কোটা বারু চেম্বার অভ কমার্স-এর সদস্যরা করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে। সবাইকে নিয়ে এজেন্সির অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন সেকশন ও কমপিউটর ডাটা এন্ট্রি সেকশনে চলে এল ও, সেখান থেকে ফরেনসিক সেকশনে, প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছে এজেন্সির অপারেটর আর টেকনিক্যাল কর্মীরা কি পদ্ধতিতে কাজ করবে। একটা অভিজাত রেস্তোরাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, চাইনীজ খাবার পরিবেশন করল বেয়ারারা। আপ্যায়ন পর্ব শেষ হতে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অতিথিরা। কাল সকালের প্লেনেই কুয়ালালামপুরে ফিরে যাবে রানা, কাজেই নতুন এজেন্সির অপারেটর ও কর্মচারীদের সঙ্গে রাতেই মীটিঙে বসতে হলো কার কি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে।

হোটেল কার্লটন ইন্টারন্যাশনাল গজমতি রোডে, একটা স্যুইট আগেই বুক করা হয়েছিল, পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে গেল। কাপড়চোপড় ছাড়ল না, ব্রীফকেসটা লিভিংরুমের একটা সোফায় রেখে ফোনের রিসিভার তুলে রাশেদের বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল আবার। কিন্তু না, এখনও সে ফেরেনি।

এবার আর ইতস্তত করল না রানা, মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ফোন করল। ডিউটি অফিসার জানাল, অফিসেই আছে রাশেদ কিন্তু জরুরী মীটিঙে ব্যস্ত, ডেকে দেয়া সম্ভব নয়। জরুরী মীটিং, বিরক্ত করা উচিত নয়, কাজেই রানা অনুরোধ করল, 'আপনি শুধু তাকে জানাবেন যে কার্লটন ইন্টারন্যাশনাল থেকে

আমি মাসুদ রানা তার খোঁজ করেছি। এ-ও জানাবেন যে কাল সকাল দশটার ফ্লাইটে কুয়ালালামপুরে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

রাত তখন দুটো, টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। রিসিভার তোলার আগেই বুঝতে পেরেছে কার ফোন। দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'ওরে শালা!'

'দুঃখিত, দোস্ত। সত্যি দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল রাশেদ। 'বুঝতেই পারছিস, খুব বিপদে আছি, তা না হলে...'

'বিপদ? কি বিপদ?'

'এটা খোলা লাইন। দেখা হলে বলব,' রাশেদের কথার সুরে সতর্কতা।

'কোত্থেকে বলছিস? কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি, কখন দেখা হবে?'

'কোত্থেকে বলছি, কখন দেখা হবে, এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না,' দ্রুত, প্রায় হড়বড় করে কথা বলছে রাশেদ। 'তবে না, প্লীজ, কাল সকালের ফ্লাইটে তুই ফিরবি না। অন্তত আঠারো ঘণ্টা সময় দে আমাকে, যেভাবে হোক সময় বের করে নেব।'

'কিন্তু জরুরী কাজ ফেলে এসেছি, কুয়ালালামপুরে দুপুরের মধ্যে ফিরতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এত রাতে নিশ্চয়ই কাজ করছিস না—ঠিকানা দে, আমি তোর কাছে আসি, আর তা না হলে তুই আমার হোটেলে চলে আয়। অন্তত সকাল পর্যন্ত আড্ডা দিই...'

'না, ভাই। তুই বুঝতে পারছিস না, অসম্ভব। প্লীজ, রানা, ফ্লাইটটা মিস্ কর! রাখি রে। হোটেলেই থাকিস, সময়মত আমি ফোন করব...' রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রাশেদ।

ক্রেডলে রিসিভার রাখার সময় আপনমনে বিড়বিড় করল রানা, 'আশ্চর্য তো!'

বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে পারেনি, রাতেই ট্র্যাভেল এজেন্সিতে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে সকালের ফ্লাইটে কুয়ালালামপুরে ফিরছে না। সকাল থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত হোটেলেই অপেক্ষা করল, কিন্তু রাশেদ যোগাযোগ না করায় প্রথম দিন কেমন কাজ হচ্ছে দেখার জন্যে নিজের নতুন শাখা অফিসে চলে এল, হোটেলের রিসেপশনে বলে এসেছে কেউ খোঁজ করলে ওর অফিসের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।

অপেক্ষার অবসান ঘটল বিকেল ঠিক চারটের সময়। হোটেলে না পেয়ে অফিসে ফোন করেছে রাশেদ। 'এখুনি চলে আয়, দোস্ত। অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে এনেছি, মেইড সার্ভেন্টকেও ছাড়িনি—এইমাত্র ডেকে বলে দিলাম কি কি খেতে পছন্দ করিস তুই। রাতটা তো বটেই, কালও সারাদিন গল্প করা যাবে। একদিন ছুটি নিয়েছি।'

'আসছি।'

হোটেল থেকে দুপুরে বেরুবার সময় রেন্ট-আ-কার থেকে একটা টয়োটা স্টারলেট ভাড়া করেছে রানা, সেটা নিয়েই রওনা হলো। স্রেফ সতর্কতা, রওনা হবার আগে গাড়ির ফুয়েল ট্যাংক, শোল্ডার হোলস্টারের রিভলভার আর মোজার

ভেতর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা চেক করে নিল। রাশেদের কটেজটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে, ট্র্যাফিক জ্যামে না পড়লেও পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে।

চারদিকে শুধু রক্ত। খাটের ওপর ঝুঁকে তোশকে সদ্য পাট ভাঙা ধবধবে সাদা চাদর বিছাচ্ছিল রাশেদ, দরজার দিকে পিছন ফিরে। সাদা চাদর রানার প্রথম পছন্দ, সে জানত। তোশকের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে চাদরে, বাকি অর্ধেক নগ্ন। কে জানে, প্রিয় বন্ধুর আগমন উপলক্ষে আপনমনে হয়তো গুনগুন করছিল বা শিস দিচ্ছিল সে, কাপুরুষ আততায়ী পিছন থেকে কোপ মারে ঘাড়ের ওপর। অস্ত্রটা ম্যাশেটি হবারই বেশি সম্ভাবনা, তবে চায়নিজ কুড়ালও হতে পারে। মুখ থুবড়ে সাদা চাদরের ওপর পড়েছে রাশেদ, সাদার ওপর লাল রক্ত এখনও পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি। তবে খাট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত প্রায় সবটুকুই শুষে নিয়েছে কাশ্মীরী কার্পেট, ভেজা অংশটুকু কালচে দেখাচ্ছে। রাশেদের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, তবে বিচ্ছিন্ন হতে খুব একটা বাকিও নেই। খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, ভাঁজ করা পা আর হাঁটু কার্পেটে। খালি গা, কোমরে সাদা বক্সার শর্টস।

সম্ভবত কাতর আওয়াজ শুনে কিচেন থেকে ছুটে এসেছিল মধ্যবয়স্কা মেইডসার্ভেন্ট, বেডরুমের দরজা পেরিয়ে দু'এক পা ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। মনিবের অবস্থা আর আততায়ীর ভয়াল মূর্তি দেখে পালাবার জন্যে আধ পাক ঘোরে সে, কিন্তু তাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে দেয়া হয়নি। বোধহয় চিৎকার করারও সময় পায়নি। অবশ্য চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ। রাশেদের কটেজটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া লিচু বাগানের ভেতর।

মেইডসার্ভেন্টের লাশ দেখে অস্ত্রটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা। রাশেদের ঘাড় দু'ফাঁক করা হয়েছে ম্যাশেটি দিয়ে। মেইড সার্ভেন্টকে পালাতে দেখে সেটাই ছুঁড়ে মারে আততায়ী। চৌকাঠের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে মহিলা, ম্যাশেটিটা মাথার পিছনে খুলিতে গাঁথা।

আততায়ী পালাবার সময় পায়নি, কটেজেই লুকিয়ে আছে। বাথরুমে রয়েছে সে। দম বন্ধ করে অপেক্ষায় আছে। ভাবছে, কে এল? লাশ দুটো দেখে কি করবে? পালাবে, নাকি ফোন করবে পুলিসকে?

খুনী একটা ভুল করেছে। রানার আসার আওয়াজ পেয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি লুকাতে গিয়ে খেয়াল করেনি পা দিয়ে ফেলেছে রক্তের ওপর। রক্তে ভেজা জুতোর ছাপ ক্রমশ হালকা হয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেছে। পা দুটো ভেতরে ঢুকেছে, বেরিয়ে আসেনি।

আক্রোশ আর আবেগ চেপে রেখে অভিনয় শুরু করল রানা। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, বেডরুমের এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছে, একটা চোখ বাথরুমের দরজার দিকে। দরজাটা আধ খোলা। ভেতরে বাথটাবের অংশবিশেষ, পুরানো আমলের শাওয়ার রিঙ, পর্দা, মেডিসিন কেবিনেট, ঢাকনি সহ একটা প্লাস্টিকের বালতি দেখা যাচ্ছে। মেঝের ম্যাট কুঁচকে রয়েছে, জুতোর কিনারা ঘষা খাওয়ায়

সাদা টাব-এর গায়ে অস্পষ্ট লালচে দাগ ফুটেছে।

পর্দার আড়ালে রয়েছে লোকটা, টয়লেটের দিকটায়।

বাথরুমের দিকে পিছন ফিরল রানা। তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে গিয়ে লোকটাকে আতঙ্কিত করতে চাইছে না। শাওয়ার আর টয়লেটকে আলাদা করা পর্দা না ছুঁলে ওকে সে দেখতে পাবে না। পর্দা ছুঁলে কাঁপবে ওটা, কাজেই ছোঁবে না।

লোকটা আশ্বস্ত বোধ করুক। নিচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। ডায়াল করল রাশেদের অফিসের নম্বরে, লাইন পেতেই আবোলতাবোল বকতে শুরু করল। 'হ্যালো? এ তুমি আমাকে কোথায় পাঠিয়েছ! ওহ্ গড, বেডরুমে শুধু রক্ত দেখতে পাচ্ছি! একটা নয়, একজোড়া লাশ পড়ে আছে। ধ্যেত, খুন করার পর খুনীরা কি আর থাকে! না, ভাই, এ-দেশে আর এক মুহূর্তও থাকছি না আমি। ফোন রেখেই পালাচ্ছি...' বলার সুরে আতঙ্ক, অপরপ্রান্তের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছে না। ভাবছে, খুনী ইংরেজি না জানলে ওর এই অভিনয় কোন কাজে লাগবে না—লোকটাকে বোঝানো দরকার যে ও পুলিস ডাকছে না। তাতে করে চিন্তা করবে সে, উপলব্ধি করবে হাতে খানিকটা সময় আছে, আগন্তুক ফিরে গেলেই কারও চোখে ধরা না পড়ে পালাতে পারবে। 'না!' রিসিভারে চিৎকার করছে ও। 'পুলিসী ঝামেলার মধ্যে জড়াতে রাজি নই আমি! কি? না...এখনও জানি না পালিয়ে কোথায় যাব।' ফোনে কথা বলছে, সেই ফাঁকে দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। সাত কি আট মিনিট আগে মেইন রোড বুয়াং থেকে একটা সাইড রোডে ঢুকেছিল ও। ওই সাইড রোডের এক ধারে নীল একটা সেডান দেখে এসেছে, আরোহী ছিল দু'জন। বিজনেস সুট পরা, মাথায় স্ট্র হ্যাট, শান্ত ভঙ্গিতে আলাপ করছিল। ব্যাপারটা শুধু লক্ষই করেছে, মনোযোগ দেয়নি। এই মুহূর্তে, জানালার দিকে মুখ করে ফোনে কথা বলার সময়, বাগানের মাঝখানের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে বাগান থেকে বেরিয়ে সাইড রোডের ঠিক কোথায় মিলিত হয়েছে সেটা। গাছপালার আড়াল থাকায় গাড়িটা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা যে ব্যাকআপ টীমের কার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই সঙ্গীকে বাইরে রেখে খুনী একা ঢুকেছে কটেজে।

'না, জিনিসটা এখনও আমি পাইনি। অসম্ভব, এখন আর খোঁজা সম্ভব নয়...ওহ্ গড! কেন জানব না এটা খোলা লাইন! কিন্তু ভেবে দেখো, এখন আর ওটা পেয়েই বা কি লাভ?' ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ল রানা। 'ঠিক আছে, মন দিয়েই শুনছি। কিন্তু আর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড, তার বেশি লাইনে আমি থাকব না। বলো কি বলবে...'

খাটের ওপর বসায় পায়ের গোড়ালি খালি হাতটার নাগালের মধ্যে চলে এল। মোজার ভেতর থেকে খাপ থেকে ছুরিটা হাতে নিল রানা। লোকটাকে গুলিই করা উচিত, সেটাই নিরাপদ। ব্যাকআপ টীমটাকে সতর্ক করতে চায় ও, সেজন্যেও গুলি করা দরকার। কিন্তু অন্য দিকে সমস্যা আছে। কিছুটা সময় কটেজে থাকতে হবে ওকে, একা। গাড়ির আরোহী দু'জন কতটুকু অধৈর্য, ওর জানা নেই। গুলির শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে যদি ছুটে আসে, তাদেরকেও খুন না করে উপায় থাকবে না।

যাকে-তাকে খুন করলেই প্রতিশোধ নেয়া হয় না, প্রথমে জেরা করে তথ্য আদায় করতে হয়, জেনে নিতে হয় মূল অপরাধী কে। রানা চাইছে ব্যাকআপ টীমের অন্তত একজন ওর পিছু নিক।

'ঠিক আছে,' রানার গলা কেঁপে গেল। 'তোমার কথাই ঠিক, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। এখানকার পরিস্থিতি দেখলে তুমিও নার্ভাস হয়ে পড়তে। গুডবাই। ফোন রেখেই পালাচ্ছি আমি। টিন মাইনে দেখা হবে–হয়তো।'

ঝনাৎ করে ক্রেডলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বাথরুমের দিকে ফিরল রানা। বাটিকের নকশা করা পর্দা সামান্য নড়ছে, যেন একটু বাতাস লেগেছে। রক্ত এড়িয়ে আধ খোলা দরজার সামনে চলে এল ও। একটা পায়ের চাপে কবাটটা পুরোপুরি খুলে ফেলছে, সেই সঙ্গে হাতের স্টিলেটোটা ছুঁড়ল, বেল্ট লেভেলের একটু ওপরে, পর্দার ঠিক মাঝখানে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। রডের সঙ্গে ঝোলানো পর্দা আঁকড়ে ধরে বাথটাবের দিকে সটান পড়ে যাচ্ছে, বাথরুমে ঢুকে ধরে ফেলল রানা। রডের একটা প্রান্ত দেয়াল থেকে খুলে আসায় খানিকটা প্লাস্টার খসে পড়ল মেঝেতে।

প্লাস্টিক পর্দায় মোড়া লোকটার মাথা ফুটবলের আকৃতি পেয়েছে, উল্টো করা ওয়ালথার দিয়ে বলটার মাথায় পাঁচ কি ছ'বার আঘাত করল রানা, যতক্ষণ না নেতিয়ে পড়ল লোকটা। ছেড়ে দিতে মেঝেতে পড়ে গেল, পর্দা সরিয়ে চেহারাটা দেখল ও, একটা চোখ রেখেছে খোলা জানালা দিয়ে বাগানের ওপর। লোক দু'জন এলে বাগান হয়েই আসবে।

লোকটা মালয়ী, পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়েস হবে। শরীরে মেদ নেই, পেশীগুলো ফুলে আছে। পরনে সাদা ট্রাউজার, স্পোর্টস শার্ট, কালো জুতো আর মোজা, মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল।

বেডরুমে, বিছানার পাশের টেবিলে একটা অ্যালার্ম ক্লক টিকটিক করছে। পৌনে পাঁচটা বাজে। ব্যাকআপ কারের আরোহীরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বেডরুমে ফিরে এসে খাটের পাশে দাঁড়াল রানা। এতক্ষণে ওর চোখ দুটো ভিজে আসছে। লাশের ওপর ঝুঁকে বিস্ফারিত চোখ দুটো আলতো হাতের স্পর্শে বন্ধ করে দিল। আরও একটু ঝুঁকে ঠোঁট ছোঁয়াল বন্ধুর কপালে। বিড়বিড় করে বলল, 'কথা দিলাম, বন্ধু, প্রতিশোধ নেব।' আবার বাথরুমে ঢুকল ও। ছুরিটা টান দিয়ে খুনীর পেট থেকে বের করল, পর্দায় রক্ত মুছে ভরে রাখল গোড়ালির ওপর খাপে। মৃত্যুর জন্যে ছুরিটা দায়ী নয়, কাজটা সেরেছে ওয়ালথারের বাঁট।

বেডরুমে ফিরে এসে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। বাগানের মাথার দিকে ফাঁকা দুটো গুলি করল। এবার দেখা যাক কি ঘটে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ছুটে কটেজ থেকে বেরিয়ে এল ও, একজোড়া নারকেল গাছের পাশে পার্ক করা টয়োটার আড়ালে এসে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। বাগানের ভেতর প্রচুর ফুলগাছ আর ঝোপ আছে, আড়াল পেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। সাইড রোডের ওপারে একটা লেক আছে, দুপুরে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় দ্রুতগতি স্রোত কলকল ছলছল শব্দ করছে। পরিবেশটা সম্পূর্ণ শান্ত, কাছাকাছি বাড়িটা পাঁচশো গজ দূরে।

বাগানের ভেতর লোকটাকে ঢুকতে দেখল রানা, একাই আসছে। বিশ হাত

দূর থেকে টয়োটাকে পাশ কাটাল সে। সাবধানে, ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। কটেজে ঢুকতে সায় দিচ্ছে না মন, কিন্তু কি ঘটেছে জানতে হলে না ঢুকেও উপায় নেই। বারান্দায় উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মিনিট। কোথাও কোন শব্দ নেই। সাহস করে খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে ঢুকল।

টয়োটার দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। স্টার্ট দিয়েই ছেড়ে দিল গাড়ি। বাগান হয়ে গেট পেরুল সগর্জনে, ছোট্ট এক লাফ দিয়ে সাইড রোডে পড়ল। পার্ক করা সেডানকে পাশ কাটিয়ে এল তীর বেগে। ভিউ মিররে চোখ, সেডানের হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখল রানা, ইউ টার্ন নিচ্ছে। ভাগ্যের ওপর খুশি হয়ে উঠল, ঠিক যা চেয়েছিল তাই ঘটছে।

দিনের আলো আরও ঘণ্টা দুয়েক পাওয়া যাবে। পালাবার ভান করছে রানা, চাইছে না ব্যাকআপ কারের ড্রাইভার ওকে হারিয়ে ফেলুক। আবার পিছু নেয়াটা খুব সহজ হয়ে গেলে লোকটার মনে সন্দেহ জাগবে, গাড়ি থামিয়ে বন্ধুদের ডেকে নেবে সে। ইতিমধ্যে টয়োটার নম্বর জানা হয়ে গেছে তার।

শহর থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে রানা। আবোলতাবোল বলে মনে হলেও, এমআই-এর ডিউটি অফিসারকে দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে ও। লাইনে বেশ অনেকক্ষণ ছিল, কাজেই কলটা ট্রেস ব্যাক করতে ওদের কোন সমস্যা হবে না। রাশেদের বাড়ির নম্বর থেকে ফোন করে বলা হয়েছে দু'জনেই খুন হয়ে গেছে, এই দু'জন কারা বুঝে নিতে পারবে। এমন কি, কটেজ থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যাবে ও, তা-ও বলে এসেছে। সেই টিন মাইনের দিকেই যাচ্ছে ও।

ছোটখাট দুটো শহর পেরুল রানা—কাডোক আর পাণ্ডকাট কালোঙ। দুই শহরের মাঝখানে কয়েকটা কামপাঙ অর্থাৎ গ্রাম পড়ল। রাস্তায় যানবাহনের তেমন ভিড় নেই। শহর দুটো পেরিয়ে আসার পর শুরু হলো পাহাড়ি এলাকা। ইতিমধ্যে কোটা বারু থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সরে এসেছে ওরা। ঢাল বেয়ে বাটু মেনিনজাউ পাহাড়ের মাথায় উঠে এল টয়োটা, উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নেমে এল খুদে শহর মাচায়-এ, পুব দিকে বাঁক নিয়ে সাগরের দিকে যাচ্ছে, চার নম্বর হাইওয়ে ধরে। তিন নম্বর হাইওয়েতে পৌঁছে ওঙ পাহাড় টপকাল রানা। ওঙ থেকে তেমিয়াং ত্রিশ কিলোমিটার, ওখান থেকে পুবে বহুদূর পর্যন্ত আর কোন শহর নেই, ম্যাপে চিহ্নিত কোন ভাল রাস্তাও নেই। মেইন রোড ছেড়ে পুব দিকেই যাচ্ছে। সামনে শুধু পাহাড় আর বনভূমি, লোকবসতি নেই বললেই চলে। রাশেদের সঙ্গে এদিকটায় আগেও দু'একবার বেড়াতে এসেছে রানা, তবে ঘুরেফিরে সব কিছু দেখা হয়নি। শেষবার এসেছিল বছর তিনেক আগে, টিন মাইনগুলো তারও অনেক বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, সেডানের ফুয়েল যেন শেষ হয়ে না যায়। দক্ষিণ দিকে বাঁক ঘোরার পর একটাও গাড়ি দেখেনি ও। সমতল উপত্যকায় ধানখেত আর রাবার বাগান দেখা যাচ্ছে। সেগুলোকে পিছনে ফেলে জঙ্গলে ঢুকল টয়োটা। জান বাঁচানো ফরজ, এই রকম একটা ভঙ্গি নিয়ে ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে। কারণ ব্যাকআপ কারের ড্রাইভার ফুলস্পীডেই ধাওয়া করছে

ওকে। রাস্তাটা সরু হলেও এককালে কার্পেটিং করা ছিল। এখনকার অবস্থা করুণ। আলকাতরার চিহ্নমাত্র নেই, নুড়ি পাথরও অদৃশ্য হয়েছে, খানা-খন্দে ভরা। গর্তগুলোকে এড়াবার জন্যে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে ছুটছে টয়োটা। রাস্তার এক ধারে একটা সাইন দেখা গেল—সামনে হাতি চলাচল করে। তারপরই শুরু হলো মাইন এলাকা। এদিকের টিন মাইন সবগুলোই প্রাচীন, চীনারা মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে খনি থেকে টিন বের করত।

আরও একটা সাইন দেখল রানা। চিয়াং-এশিয়াটিক টিন, লিমিটেড। টয়োটার স্পীড কমিয়ে জঙ্গলের দু'দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। সিকি মাইল এগোবার পর ডান দিকে অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ল চোখে সরু একটা আঁকাবাঁকা পথ, ঝোপ-ঝাড় গজিয়ে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। স্প্রিঙ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা না থাকলে গাড়ি ঢোকাতে কোন অসুবিধে নেই।

ওর পিছনের উঁচু টিবির ওপর উঠল সেডান, রোদ লেগে ঝলসে উঠল উইন্ডশীল্ড। বাঁক নিয়ে ঝোপে ঢাকা পথ দিয়ে ছুটল টয়োটা। এখন ব্যাপারটা প্রতিপক্ষের ওপর নির্ভর করে। মাথায় ঘিলু থাকলে রানার পিছু নিয়ে আসবে না সে। এত দূর যখন এসেছে, ওটার পরিমাণ খুব বেশি বলে মনে হয় না। তবে সেডানে যদি ফোন বা রেডিও থাকে, রানার কপালে বিপদ আছে। লোকটা হয়তো শুধুই বোকা নয়, সাহস দেখিয়ে গর্ব করতে ভালবাসে। বস্ প্রশংসা করবে, এই লোভেই সম্ভবত রানার পিছু ছাড়েনি।

পথের দু'পাশে উঁচু-নিচু সাদা বালি আর মাটির স্তূপ দেখল রানা, পাশের গর্ত থেকে তুলে এনে টিন বের করার পর ফেলে রাখা হয়েছে। গর্তের ভেতর ঢুকছে টয়োটা, কাঁকর ছড়ানো রাস্তা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। টুল ও ওয়াচম্যান-এর একটা শেড দেখা গেল, মাথায় চালা নেই। ঢাল শেষ হতে টয়োটা থামাল রানা। রাস্তাটা শেষ হয়নি, গর্তের ভেতর আরও একটা গভীর গর্তকে চারদিক থেকে বেড় দিয়ে রেখেছে। গভীর অর্থাৎ দ্বিতীয় গর্তের ঠোঁটে গাড়ি থামিয়েছে ও। রোলার কোস্টার-এর মত একটা কাঠামো গর্তটার ভেতর নেমে গেছে। গাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছে গর্তের নিচেটা, শুকনো খটখটে। স্টার্ট বন্ধ করে নিচে নামল রানা, কান পাতল, হাতে ওয়ালথার। এঞ্জিনের কোন শব্দ নেই। লোকটা হেঁটে আসছে। কিংবা হয়তো আসছে না।

চড়াই বেয়ে গর্ত থেকে উঠে এল রানা। বালি ও মাটির কয়েকটা স্তূপকে পাশ কাটিয়ে টুল শেড-এর দিকে যাচ্ছে। আশপাশের গাছ থেকে কয়েকটা বানর ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। লোকটা যদি আসে, প্রথমে টয়োটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে। যথেষ্ট কৌতূহলী আর সাহসী হলে ভাল হয়, ভাবল রানা, সেই সঙ্গে সামান্য একটু বোকা।

তিন বিশেষণেই সমৃদ্ধ সে। শ্রবণেন্দ্রিয় আর দৃষ্টিশক্তিও প্রখর। তার ওপর হাতে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র, রানাকে দেখামাত্র পরপর কয়েকটা গুলি করে বসল, ভাল করে লক্ষ্যস্থির না করেই।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, বালির স্তূপে ঢলে পড়ল, গড়িয়ে সরে এল

আড়ালে। কে জানে এই অভিনয়ে কাজ হবে কিনা। ওয়ালথারটা হোলস্টারে গুঁজে ছুরিটা দু'সারি দাঁতের ফাঁকে আটকাল, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বালির স্তূপ বেয়ে ওপরে উঠছে। তাড়াহুড়ো করলে ঝুরঝুরে বালিতে ধস নামবে।

নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠে আবার চেঁচামেচি শুরু করল বানরগুলো, এবার আরও জোরেশোরে। এই সুযোগে দ্রুত স্তূপ বা ঢিবির মাথায় উঠে এল রানা, শুয়ে থাকল চুপচাপ।

রাইফেলটা হালকা ধরনের কিছু একটা হবে, ক্লিপে সম্ভবত আট রাউন্ড বুলেট আছে। কম দূরত্বে বিপজ্জনক অস্ত্র। একটাই ভরসা, আলো এত কম যে গুলি করার উপযোগী নয়।

রানার মনে হলো লোকটা ওকে খুন করতে চাইছে না। অন্তত এখুনি নয়। তথ্য পাবার জন্যে প্রথমে সে জেরা করতে চায়। অর্থাৎ দু'জনের একই উদ্দেশ্য। ও অপেক্ষা করছে। দেখা যাক ধৈর্যের পরীক্ষায় কে জেতে।

লোকটাই প্রথমে ধৈর্য হারাল। ভাঙাচোরা টুল শেডের পাশে দেখা গেল তাকে। সতর্ক, তবে আত্মবিশ্বাসী, অন্তত আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকার ঋজু ভঙ্গিটা সে-কথাই বলে। তার ধারণা, প্রথম দফার বুলেটগুলো বিফলে যায়নি। সময় নষ্ট করা বোকামি হচ্ছে ভেবে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আহত প্রতিপক্ষকে জেরা করে তথ্য আদায় করবে। সম্ভব হলে ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ঢোকাবে, ভারী বস্তার মত ফেলবে বসের পায়ের সামনে। এরকম একটা কৃতিত্ব দেখানোর লোভ সামলানো সত্যি কঠিন।

শেডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগোল। অত্যন্ত সাবধানে আসছে, প্রতিবার এক পা করে। কিন্তু সে গ্রাউন্ড লেভেলে রয়েছে, আর রানা রয়েছে তার মাথার ওপর। কাছাকাছি হতে তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল রানা, হা-হাস্-হা-হাস্-

হাত দিয়ে নিঃশব্দে নিজের সামনে খানিকটা বালি জড়ো করছে রানা। লোকটা সরাসরি ওর নিচে পৌঁছুতেই জড়ো করা বালির স্তূপটায় ধাক্কা দিল দুই হাতে, বালির বৃষ্টি ঝরে পড়ল তার মাথায়। ঝট্ করে মুখ তুলল সে, অমনি কানা হয়ে গেল। ঢিবি থেকে হড়কে নিচে নামল রানা, নামল একেবারে লোকটার গায়ের ওপর।

দু'চোখে বালি নিয়ে বুনো মোষের মত লড়ল লোকটা। কব্জিতে রানার লাথি খেয়ে রাইফেলটা ছেড়ে দিল সে। বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড ধস্তাধস্তি হলো, তারপর দেখা গেল তার বুকের ওপর চড়ে বসেছে রানা। কিন্তু ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিল সে, রানাকে বুক থেকে ফেলে দিয়েছে। দুই কি তিন পা পিছাল, তারপর লাফ দিল রানাকে লক্ষ্য করে, হাতে একটা সরু ও লম্বা ছুরি বেরিয়ে এসেছে। খুন করে ফেলবে, এই ভয়ে স্টিলেটোটা ব্যবহার করতে পারছে না রানা।

ছুরির ফলা রানার বাম বাহু না ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, ছুঁলে অগভীর, দীর্ঘ একটা ক্ষত তৈরি হত। লোকটা ছুরি চালিয়েছে, কিন্তু এড়াবার জন্যে রানা পিছায়নি, বরং সামনে এগিয়েছে। এখনও প্রায় অন্ধ লোকটা, ডান হাতের আঙুলগুলো ওই বালি

ভর্তি চোখের ভেতরই ঢোকাবার চেষ্টা করল। মাটিতে হাঁটু গাড়ল সে, নিজের সামনে ছুরিটা এদিক ওদিক চালাচ্ছে। লাথি মেরে মুঠো থেকে সেটা খসাল রানা, হাতের কিনারা দিয়ে একটা কোপ মারল ঘাড়ের ওপর। দু'হাতে রানার একটা পায়ের নাগাল পেয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। নিজেকে মুক্ত করতে ব্যস্ত রানা, সফলও হলো, কিন্তু সেই সঙ্গে লোকটাকে সিধে হবার সুযোগ করে দিয়েছে। সিধে হয়েই আবার রানার দিকে ছুটে এল। ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, পেট চেপে ধরে টলতে টলতে পিছু হটল সে। বিরতি না নিয়ে আবার আঘাত করল রানা। শূন্যে লাফ দিল, পা-দুটো নেমে এল লোকটার বুকে। দু'জনেই ছিটকে পড়ল, একটা গড়ান দিয়ে তার বুকে আবার চেপে বসল ও, নাকে-মুখে দমাদম ঘুসি মারছে।

স্থির হয়ে গেল লোকটা।

ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। টয়োটা থেকে একটা টর্চ নিয়ে এল রানা, অপর হাতে ওয়ালথার নিয়ে লোকটার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, নড়ে উঠল লোকটা। তারপর ব্যথায় কাতরাতে শুরু করল। চেহারাই বলে দেয় লোকটা মালয়ী। বয়েস ত্রিশ পেরোয়নি এখনও, পেটা শরীর।

'নাম বলো।'

ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, কিন্তু চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। 'গো টু হেল,' ইংরেজিতে বলল সে।

'যদি ভেবে থাকো আমি তোমাকে খুন করব, ভুলে যাও,' বলল রানা। ছয় ব্যাটারির টর্চটা একটা পাথরের ওপর রেখেছে, উজ্জ্বল আলোর সবটুকুই পড়েছে লোকটার মুখে। 'তুমি বেঁচে থাকবে, তবে পঙ্গু হয়ে। দুই হাঁটুতে গুলি করে ফেলে রেখে যাব এখানে, শহরে ফিরে ফোন করে পুলিসকে জানাব কোথায় তুমি আছ। কেমন হবে সেটা?'

রানাকে লক্ষ্য করে এক দলা থুতু ফেলল সে। মাথাটা সরিয়ে নেয়ায় রানার মুখ ভিজল না। ঝুঁকে ওয়ালথার ধরা হাতটা লম্বা করল ও, লোকটার ডান পায়ের হাঁটুতে ঠেকল মাজল। 'নাম?'

'ওয়াসিম।'

'এই তো লাইনে আসছ। শোনো, ওয়াসিম। তুমি একজন টেরোরিস্ট। তোমাদের একটা দল আছে। দলের একজন লীডার আছে। আমি সেই লীডারের নাম জানতে চাই। আর জানতে চাই আবু রাশেদকে কেন তোমরা খুন করলে।'

'আপনি কে আমি জানি না,' বলল লোকটা। 'শুধু জানি বিদেশী। একজন বিদেশী হয়ে কেন শুধু শুধু মালয়েশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছেন?'

'ও বাবা! তুমি দেখছি আমার ভাল চাইছ!'

লোকটার ব্যথায় আড়ষ্ট মুখে হাসি ফুটল। 'খোদার কসম বলছি, আমার পরামর্শ শুনলে নিজের উপকার করবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন মালয়েশিয়া ছেড়ে পালিয়ে যান।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। আপনি বললেন আমরা টেরোরিস্ট। কথাটা আংশিক সত্যি। শুধু টেরোরিস্ট নই, আমরা বিশাল এক গেরিলা বাহিনীর সদস্য। এই দেশের সেনাবাহিনীই যেখানে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না, আপনি আমাদের কি করতে পারবেন?'

'শুনতে খারাপ লাগছে না। বলে যাও, সব কথা শুনতে চাই আমি।'

'আমাদের দলটা আন্তর্জাতিক মাফিয়ার মালয়ী সংস্করণ,' বলল লোকটা। 'এ-সব কথা আপনাকে জানাতে আমি কোন দ্বিধা বোধ করছি না, কারণ আমাদের দলের একজন লোকও মৃত্যুকে ভয় পায় না। আমাকে আপনি খুন করলে আমাদের লীডার আমার পরিবারকে এক লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে।'

'তোমাদের লীডার সম্পর্কে বলো।'

'তাঁর সম্পর্কে কে না জানে! পুলিস বলুন, ইন্টেলিজেন্স বলুন, সেনাবাহিনী বলুন; দাতো সোলায়মানের নাম শুনলে সবাই আঁতকে উঠবে।'

'কে সে? কি সে?'

'আমরা যারা তাঁর গেরিলাবাহিনীতে আছি, আমাদের কাছে তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য—আমাদের গড ফাদার। প্রশাসন আর সরকারী সমস্ত এজেন্সির কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয়—টেরর।'

'তার উদ্দেশ্য?'

'কেন এত কথা জানতে চাইছেন? জেনে কি লাভ?' আবার হাসল ওয়াসিম। 'আপনি কে আমি জানি না, তবে আন্দাজ করছি মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। যদি ইচ্ছে হয় আমাকে খুন করুন, তারপর ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন। ওরাই আপনাকে দাতো সোলায়মানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব জানাবে।'

'আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। মালয়েশিয়ার এমন কোন শহর নেই যেখানে আমাদের চর পাবেন না। এই যে আপনার পিছু নিয়ে এখানে আমি এসেছি, কোটা বারুতে আমার সহকর্মীরা তা জেনে ফেলেছে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে তারা। সোলায়মান বাহিনী অজেয়। মূল দলটা জঙ্গল আর পাহাড়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। মালয়েশিয়া সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়েও কোন সুবিধে করতে পারছে না। উদ্দেশ্য? প্রথমে আমরা কোটা বারু দখল করে নেব। কোটা বারু হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। থাইল্যান্ডে আফিম চাষ হচ্ছে, সেই আফিম থেকে হেরোইন তৈরি করার জন্যে কোটা বারুতে কারখানা তৈরি করব আমরা। আমাদের নেটওঅর্ক ধীরে ধীরে আরও বড় হবে, গোটা মালয়েশিয়া দখল করে নেব আমরা। কেলানতান আর তেরেনগানু রাজ্যের অর্ধেক বলতে গেলে আমরাই নিয়ন্ত্রণ করছি...'

'রূপকথা শোনাচ্ছ?'

'আপনি বিশ্বাস করছেন না? মহাথির মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করুন, সে বিশ্বাস করে। তার বিশ্বাস করার কারণ আছে, কারণ সে জানে আমাদের গড ফাদারকে কারা সাহায্য করছে।'

'কারা?'

'যদি বলি সিআইএ, তাহলে আংশিক উত্তর দেয়া হয়,' বলল ওয়াসিম, তারপর এমন সুরে হেসে উঠল যেন কৌতুক বোধ করছে।

'সোলায়মানের সঙ্গে তাদের রেডিও কনট্যাক্ট আছে?'

খানিক ইতস্তত করে জবাব দিল ওয়াসিম, 'ছিল, আপাতত নেই। পুরানো রেডিও, কিছু পার্টস নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আবু রাশেদকে কেন খুন করলে তোমরা?'

'তার অপরাধ সে অত্যন্ত যোগ্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, একাই একশো। আগেই বলেছি, প্রায় সব শহরে আমাদের চর আছে। তাদের ওপর নির্দেশ আছে, আমাদের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে এমন কারও কথা জানতে পারলে তাকে সময় থাকতেই মেরে ফেলতে হবে।'

'বলতে চাইছ, রাশেদ কোন অপরাধ করেনি, এমনকি তোমাদের কোন ক্ষতিও করেনি, শুধু বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে খুন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'রাশেদ আমার বন্ধু ছিল। আমি তার লাশ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিশোধ নেব।'

হেসে উঠল ওয়াসিম। 'কিভাবে?'

দু'পা পিছিয়ে এল রানা। 'সেটা জানা না জানা তোমার জন্যে সমান কথা। কারণ আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি।' ওয়ালথার ধরা হাতটা লম্বা করল রানা। গুলি করবে।

সিদ্ধান্ত পাল্টেছি বললেও, গুলি করতে ইতস্তত করছে রানা। এই লোক রাশেদকে খুন করেনি, খুনীর সহযোগী ছিল মাত্র। সোলায়মান বাহিনীর কয়েকশো বা কয়েক হাজার সদস্য রয়েছে। তাদের সবাইকে খুন করলেও রাশেদ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়া হয় না। ওর আসলে সোলায়মানকে দরকার।

ট্রিগারে আঙুল, ওয়ালথার ধরা হাতটা এখনও লম্বা করা। রানা ভাবছে। এই লোক রাশেদকে খুন করেনি, কিন্তু অন্য আরও বহু লোককে খুন করেছে। বাঁচিয়ে রাখলে আরও অনেককে খুন করবে। কাজেই একে বাঁচিয়ে রাখার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

ট্রিগারে আরও একটু চেপে বসল আঙুল, যদিও ইতস্তত ভাবটা এখনও রয়েছে। 'সোলায়মানকে কোথায় পাওয়া যাবে...' ওর প্রশ্ন শেষ হয়নি, এই সময় একটা পাখি শিস দিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল, পাখি নয়। শিস দিয়েছে কোন মানুষ। আওয়াজটা থামতেই কয়েকটা ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছায়ামূর্তিরা। বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। আট-দশটা শক্তিশালী টর্চও জ্বলে উঠল।

হাসতে হাসতে উঠে বসল ওয়াসিম। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি মিথ্যে কথা বলিনি? আমার সহকর্মীরা পৌঁছে গেছে...'

একটা লাউড হেইলার থেকে ভারী গলা ভেসে এল। 'মি. মাসুদ রানা। গুলি

করবেন না, প্লীজ। একটা ছুঁচোকে মেরে হাত গন্ধ করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্স। পিস্তলটা আপনি হোলস্টারে গুঁজে রাখতে পারেন। ছুঁচোটা আমাদের সাইটে রয়েছে।'

'যাহ্ শালা!' তিক্ত হাসি ফুটল ওয়াসিমের ঠোঁটে। হঠাৎ একটা হাত তুলে মুখের ভেতর আঙুল ঢোকাল সে, আঙুল দিয়ে ধরে মাড়ি থেকে একটা দাঁত খসাল। বিষ ভরা একটা ক্যাপসুল, রানা বাধা দেয়ার আগেই গিলে ফেলল।

ক্যাপসুলে সম্ভবত সায়ানাইড ছিল, দু'তিন বার ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল ওয়াসিম। ঝুঁকে তার পালস পরীক্ষা করল রানা। মারা গেছে। ইতিমধ্যে এমই-র এজেন্টরা ছুটে কাছে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন রানার কাঁধে হাত রাখল, নিজের পরিচয় দিয়ে হ্যান্ডশেক করল ওর সঙ্গে। কোমরে একটা মোবাইল ফোন গোঁজা রয়েছে। 'আমি আজিজ পাশা, রাশেদের বন্ধু। ডিউটি অফিসার আপনার দেয়া মেসেজ বুঝতে সময় নেয়, পৌঁছুতে দেরি হবার সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, আসার পথে সোলায়মান বাহিনীর গেরিলারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের...'

লাশটার দিকে তাকাল রানা। 'ওয়াসিম তাহলে সত্যি কথাই বলছিল। আচ্ছা, আসলে কে এই সোলায়মান? এতটা বেড়ে উঠেছে, আপনারা তার একটা ব্যবস্থা করতে পারেননি কেন?' রানার গলায় রাগ।

'রাশেদ আপনার কতটুকু ঘনিষ্ঠ ছিল আমরা জানি, মি. রানা,' বলল পাশা। 'সে আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিল। তার এই অকাল মৃত্যু আমরাও মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন আমরা কতখানি অসহায়। আমাদের সঙ্গে অফিসে চলুন, প্লীজ। ওখানে বসে আলাপ করা যাবে...'

'আমাকে আপনারা একটু একা থাকতে দিন,' বলল রানা। রাশেদ নেই, এই বাস্তব সত্যটা এতক্ষণে কাতর করে তুলছে ওকে। 'প্লীজ।' পাথরের ওপর থেকে টর্চটা নিল, ঘুরে পা বাড়াল গর্তটার দিকে।

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল পাশা, রানার গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

টয়োটায় ফিরে এসে বসল রানা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রাশেদের সঙ্গে কত মধুর সময় কাটিয়েছে ও, সে-সব স্মৃতি আপনাআপনি ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। স্থান-কাল সম্পর্কে সমস্ত সচেতনতা হারিয়ে ফেলল ও। নিজেও জানে না কখন চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে। এভাবে কতক্ষণ কাটল বলতে পারবে না, হঠাৎ সংবিৎ ফিরল টর্চের আলোয়।

টয়োটার দরজা খুলল রানা। ওর পাশের সীটে উঠে বসল পাশা। 'মি. রানা, এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। আপনি যদি আমাদের অফিসে যেতে না চান তো চলুন আপনাকে আমরা আপনার হোটেলে পৌঁছে দিই।'

'লাশটা এখন কোথায়?' ম্লান সুরে জানতে চাইল রানা।

'অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বলল পাশা। 'কাল সকালে দাফন করা হবে। আপনি থাকবেন তো?'

জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এমই-তে আপনার পদমর্যাদা কি?'

'আমি কোটা বারু ব্রাঞ্চের ইনচার্জ।'

'সোলায়মান সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চাইলে বলতে পারবেন আমাকে? সে অথরিটি আপনার আছে? রাশেদ কেন খুন হলো, ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকাল পাশা। 'আমি জানি এমই-র তরফ থেকে দু'বছর আগেই আপনাকে সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়া হয়েছে। সব ব্যাখ্যা করার জন্যেই তো অফিসে নিয়ে যেতে চাইছি আপনাকে। মি. রানা, এই এলাকা সত্যি নিরাপদ নয়। আমরা কামবিং পাহাড়ের কাছাকাছি রয়েছি। এই পাহাড় থেকেই রিঙ লীডার সোলায়মানের এলাকা শুরু। ওরা যদি খবর পেয়ে হামলা করে, আমরা সবাই মারা পড়ব।'

কঠিন সুরে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। জানতে চাইল, 'কামবিং থেকে কোন্‌দিকে কত দূর নিয়ন্ত্রণ করে সে?'

'থাই সীমান্ত থেকে মালয়েশিয়ার ভেতর দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত কিংবা হয়তো আরও বেশি। দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, সেজন্যেই সেনাবাহিনী পাঠিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। জঙ্গল এত গভীর, পাহাড়ী খাদ এত সরু, হেলিকপ্টার নামার সুযোগ নেই। চলতি বছর তিনবার সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছে, প্রতিবার প্রচুর লাশ রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে তারা। সোলায়মানের গেরিলারা এই দুর্গম এলাকায় চলাফেরা করতে অভ্যস্ত, সঙ্গে আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। খানিক পরপর ফাঁদ পেতে রাখে। অ্যামবুশ...'

'তার সম্পর্কে সব কথা জানান আমাকে। কেমন দেখতে সে? কি তার যোগ্যতা?'

'বাহান্ন বছর বয়েস, চশমা পরে, দেখে মনে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেছে, শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে। শিকাগোতে থাকার সময়ই ড্রাগের ব্যবসা ধরে। এফবিআই গ্রেফতার করে, জেলও হয়েছিল দশ বছরের, কিন্তু মাত্র তিন বছর পর ছাড়া পেয়ে যায়। সন্দেহ করা হয়, জেলে থাকার সময় সিআইএ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে থাইল্যান্ডে আসে সে, মালয়েশিয়া সীমান্তে গেরিলা ট্রেনিং নেয়। সিআই-এর ড্রাগ বিরোধী একটা ভূমিকা আছে, অন্তত প্রচার-প্রচারণায় সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। থাই-মালয়েশিয়ান সীমান্তে আফিমের চাষ অনেক আগে থেকেই হচ্ছিল, থাইল্যান্ডের মার্কিন ঘাঁটি থেকে মাদকচক্রের বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নেয়া হয়েছে, কিন্তু সোলায়মান যখন আফিম কিনতে শুরু করল, দেখেও না দেখার ভান করল তারা।

'দিনে দিনে টাকা আর শক্তি অর্জন করল সোলায়মান। নিজেই একটা গেরিলাবাহিনী তৈরি করে ফেলল। বাধা দেয়া তো দূরের কথা, সিআইএ তাকে যতভাবে সম্ভব সাহায্য করল। কারণও আছে। মহাথির মোহাম্মদকে যুক্তরাষ্ট্র একদম পছন্দ করে না। তারা সোলায়মানকে দিয়ে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এখন তো শোনা যাচ্ছে সোলায়মান কোটা বারু আক্রমণ করবে। বুঝে দেখুন, কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে। বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরের ও দিকটায়, তেরেনগানু প্রদেশে তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠছি না।'

'আর রাশেদের ব্যাপারটা?'
'আমাদের বস্ এখন কোটা বারুতে। তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত এজেন্টকে নিয়ে গত তিন দিন গোপন মীটিং করেছেন তিনি। মীটিঙে আমিও ছিলাম। বলা যায়, রাশেদের জেদেই অবাস্তব একটা সিদ্ধান্ত নিই আমরা।'
'অবাস্তব সিদ্ধান্ত?'
'হ্যাঁ।'
'সেটা পরে শুনব,' বলল রানা। 'তার আগে বলুন, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে গোপন মীটিং কেন? তারমানে সর্ষেতে ভূত?'
এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পাশা নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেও সোলায়মানের চর ঢুকে পড়েছে।'
'ওহ্ গড।'
'অবাস্তব সিদ্ধান্ত বলছি এই কারণে যে আমরা ঠিক করি সোলায়মানকে ধরতে হলে একজন মাত্র এজেন্টকে পাঠাতে হবে। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেই ঝুঁকিটা নেবে সে। আত্মহত্যাই বলতে পারেন। তার কাজ, পথে যদি মারা না যায়, সোলায়মানের মুখোমুখি হওয়া। শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে। প্রচুর গোপন তথ্য নিয়ে যাবে সে, সে-সব তথ্য সোলায়মানকে জানিয়ে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করবে...'
'বসের সঙ্গে আপনাদের গোপন মীটিঙে কে কে ছিল? তাদের মধ্যে কেউ একজন বেঈমান না থাকলে রাশেদ খুন হয় কিভাবে?'
মাথা নিচু করল পাশা। 'বস্ ছাড়া আমরা ছ'জন ছিলাম। আপনি ঠিক ধরেছেন। আমাদের এই ছয়জনের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে কে, এখনও আমরা তা ধরতে পারিনি।'
'এখানে এখন যারা এসেছে আপনার সঙ্গে, ওই ছয়জনের মধ্যে আপনি ছাড়া আর কেউ আছে?'
পাশা মাথা নাড়ল। 'না, শুধু আমি।'
'রাশেদের প্ল্যানটা কি ছিল, আরও একটু বিস্তারিত বলুন।'
'কাল রাতে রওনা হবার কথা ছিল তার,' বলল পাশা। 'কাউকে কিছু না বলে গভীর রাতে অফিস থেকে বেরুবে, সঙ্গে শুধু একটা রাকস্যাক থাকবে। তাতে ম্যাপ, অস্ত্র, সামান্য কিছু খাবারদাবার আর পানি, কয়েক দিস্তা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট, কমপিউটর ডিস্কেট এই সব থাকার কথা। রাকস্যাকটা গুছিয়ে অফিসেই রেখে যায় সে। কাল রাতে বাসে করে এদিকেই আসার কথা ছিল তার, যতদূর সম্ভব। তারপর পায়ে হেঁটে যাবার কথা।'
'কোথায়?'
'কোথায় তা কেউ জানে না,' বলল পাশা। 'কারণ সোলায়মান কখন কোন ঘাঁটিতে থাকে, কেউ বলতে পারে না। এক হপ্তা আগে রিপোর্ট পেয়েছি, সে তার একটা ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছে। রাশেদের প্ল্যান ছিল কামবিং পাহাড় টপকাবে, তারপর হারিয়ে যাবে গভীর অরণ্যে...'
'অর্থাৎ আপনাদের সঠিক কোন ধারণা নেই সোলায়মানকে কোথায় পাওয়া

যাবে,' বলল রানা। 'কোন গুজবও কানে আসেনি?'

'দশ দিন আগের এক রিপোর্টে জানতে পেরেছি কামবিং থেকে বিশ কিলোমিটার পুবে, পেটুয়াং নদীর ধারে, আমাদের একটা সেনা ইউনিটকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সোলায়মান। ঘটনাটা আরও আগের, ফুলে ওঠা লাশগুলো দেখতে পায় রাবার বাগানের একদল শ্রমিক। তারা আহত দু'জন গেরিলাকেও দেখতে পায়। শ্রমিকরা তাদেরকে বেঁধে ফেলে। দু'জনের একজন সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় লোকটাকে থানায় নিয়ে আসে তারা। কোটা বারুতে এনে আমরা তাকে ইন্টারোগেট করি। ওরা দু'জন মারা গেছে ভেবে গেরিলারা ওদেরকে ফেলে রেখে যায়।'

'দশ দিন আগে জানতে পারলেন সেনা ইউনিট নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সাত দিন আগে জানতে পারলেন ঘাঁটি ছেড়ে সরে গেছে সোলায়মান। এর তাৎপর্য হলো...'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল পাশা। 'তার একজন গেরিলা মুখ খুলেছে, এই খবর আমাদের অফিস থেকেই কেউ তাকে জানিয়েছে।'

'ঘাঁটি ত্যাগ করার খবর কোত্থেকে পেলেন?'

'রাবার বাগানের শ্রমিকরা পুলিস স্টেশনকে জানায়।'

'কামবিং পাহাড় থেকে ওই ঘাঁটি কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ত্রিশ কিলোমিটার। শ্রমিকদের ধারণা, সোলায়মান তার বাহিনী নিয়ে কাপাল পাহাড়ের দিকে সরে গেছে। কামবিং থেকে কাপাল পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। এতই দুর্গম এলাকা, রাশেদের পৌঁছুতে দশদিনের কম লাগত না।'

'তা লাগুক, তবু আমি যাব।'

পাশার মনে হলো, সে শুনতে ভুল করেছে। 'কি বললেন, মি. রানা?'

'রাশেদের প্ল্যান খানিকটা অবাস্তবই ছিল, ওই অবাস্তব অংশটুকু বাদ দেব আমি,' বলল রানা। 'ওইটুকু বাদে, প্ল্যানটা কিন্তু মন্দ নয়।'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' পাশা হতভম্ব।

'নিশ্চিত থাকুন, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেই কথাটা বলছি,' জবাব দিল রানা। 'আর শুধু কথার কথাও বলছি না, সত্যি আমি যাব।'

'এ আপনি কি বলছেন! এই এলাকা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই। তাছাড়া, কারণটা কি? কেন আপনি এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে চাইছেন?'

'উত্তরটা নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আপনিই তো তখন বললেন যে জানতেন রাশেদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বন্ধুর জন্যে...'

লজ্জা পেয়ে বাধা দিল পাশা। 'দুঃখিত, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, মি. রানা, আমরা বা সেনাবাহিনী, কেউ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।'

'তার দরকারও নেই,' বলল রানা। 'আপনি শুধু অফিসে রেখে আসা রাশেদের ব্যাকস্যাকটা আনিয়ে দিন আমাকে। ওটায় যা আছে তাতেই আমার কাজ চলবে। রিপোর্ট বা কাগজগুলো দরকার নেই, ডিস্কেটগুলোও প্রয়োজন হবে না।'

'আজ রাতে? এখুনি আনিয়ে দেব?' পাশার বিস্ময় বাধ মানছে না।

'রাশেদ কাল রাতে রওনা হত। আমি নাহয় এক রাত আগেই রওনা হলাম। ক্ষতি কি?'

কথা হচ্ছিল অন্ধকার গাড়ির ভেতর। টর্চটা জ্বেলে রানার মুখটা ভাল করে দেখল পাশা। 'ঠিক আছে। তবে তাই হোক। আপনার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, মি. পাশা, তা হয় না। আমি একা যাব।'

'কেন, আমাকে নিতে অসুবিধে কি?'

'সর্ষেতে ভূত আছে, ভুলে গেছেন? আপনি গেলে সেই ভূত জানতে পারবে। কিন্তু আমাকে সে চেনে না।'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল ওরা। ঠিক হলো, পাশা তার সহকর্মীদের জানাবে, ওদের পিছু নিয়ে কোটা বারুতে ফিরবে রানা, উঠবে নিজের হোটেলে, রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে কুয়ালালামপুরে ফিরে যাবে। আসলে রানা শহরে ফিরবে না, শহরতলিতে অপেক্ষা করবে। পাশা নিজের বাড়িতে ফেরার নাম করে অফিসে পৌঁছুবে, সেখান থেকে রাকস্যাকটা নিয়ে ফিরে আসবে রানার কাছে। টয়োটা নিয়ে আবার এই খনি এলাকায় চলে আসবে রানা, এখান থেকে পায়ে হেঁটে কমাহাং পাহাড়ের দিকে রওনা হবে, একা। টয়োটা নিয়ে শহরে ফিরবে পাশা, রেন্ট-আ-কার অফিসে পৌঁছে দেবে গাড়িটা।

দুই

রাত এগারোটা।

আকাশে উঠে আসা আধখানা চাঁদ ঘন মেঘে মাঝে মধ্যে ঢাকা পড়ছে, তবে এখুনি বৃষ্টি শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেই গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, একা। শুধু রাকস্যাকটা নয়, পাশা ওকে একটা ব্রাউনিং রাইফেল আর কিছু জামা কাপড়ও দিয়ে গেছে গর্তের সামনে। বেশ কিছুটা দূরে আসল জঙ্গল শুরু হয়েছে, সেদিক থেকে বন্য প্রাণীদের বিচিত্র আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশিরভাগই রাতজাগা পাখি আর ছোটখাট প্রাণীদের চেঁচামেচি। ডেরা থেকে বেরুনো হিংস্র শিকারীরা এদিকে যখন আসবে ভয়ে চুপ মেরে যাবে সব।

কাপড় পাল্টে একখানা খাকি শর্টস পরল রানা। মাথায় চড়াল বুশ হ্যাট। পায়ে পরল জাঙ্গল বুট। ট্রাউজার, শার্ট, টাই, জুতো-মোজা মাটির নিচে পুঁতে রাখল।

ব্রাউনিং সাফারিতে .৪৫৮ উইনচেস্টার ম্যাগনাম বুলেট ভরা যায়। অস্ত্রটা বেশ ভারী, তবে জাঙ্গল স্লিং আর টেলিস্কোপ লাগানো আছে। রাকস্যাক খুলে ভেতরের জিনিস-পত্র আরেকবার চেক করে নিল রানা। ম্যাপগুলো সবই পুরনো, তবে কাজে লাগবে।

রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ওর এই ব্যক্তিগত অভিযানটাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। তবে সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কথা একবারও ভাবল না

রানা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, অসাধ্যসাধনের ক্ষেত্রে খানিকটা পাগলামি বিরাট অবদান রাখে।

বৃত্তাকার গর্তটাকে ঘুরে ফাঁকা একটা মাঠ পেরুল রানা। জঙ্গলে ঢোকার সময় গা ছমছম করে উঠল। ইতিমধ্যে পাখিদের চেঁচামেচি থেমে গেছে, শুধু ঝিঁঝি পোকারা নীরব নয়। মাঝে মধ্যে দু'একটা বানরের গলা পাওয়া গেল, সম্ভবত স্তনের সন্ধানে ব্যস্ত শিশুকে ধমক দিচ্ছে মা।

জঙ্গলে পথ চলার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো হাতি চলাচলের ট্রেইল অনুসরণ করা। তবে এলিফ্যান্ট ট্রেইল সবসময় নিরাপদ নয়। নিজেকে আগেই সতর্ক করে দিল রানা, দেখতে পেলে সসম্মানে ওদের পথ ওদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে সভ্যতার এত কাছাকাছি হাতির দেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এদিকের জঙ্গলে পাকা রাস্তা আছে, আর হাতির পাল সাধারণত রাস্তা থেকে দূরে থাকতেই স্বস্তিবোধ করে। রানাও অবশ্য পাকা রাস্তা থেকে দূরে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে করছে।

দুই কিলোমিটার এগোতে কোন অসুবিধে হলো না। জঙ্গল এখনও তেমন গভীর হয়ে ওঠেনি। তবে সরাসরি বাঘের রাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ও। অবশ্য মালয়েশিয়ান বাঘ সংখ্যায় কম, মানুষখেকোর সংখ্যা আরও কম।

রাত আড়াইটায় কামবিং পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুল রানা। পাহাড়টা চার হাজার দুশো বিরানব্বুই ফুট উঁচু, ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড় পার হয়ে পাঁচ কিলোমিটার এগোলে ছোট একটা গ্রাম পড়বে, সেটাকে এড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পৌঁছুতে হবে লাউইট পাহাড়ে। লাউইটের নিচে ছোট আরও দুটো গ্রাম পাওয়া যাবে, আর পাওয়া যাবে তিন নম্বর হাইওয়ে, ওগুলোর কাছ থেকেও দূরে সরে থাকতে হবে রানাকে। রাশেদের ম্যাপে কিছু ফুটনোট আছে, তাতে বলা হয়েছে তেরেনগানু উপকূল থেকে মালয়েশিয়ার ভেতর দিকে, সেই থাই সীমান্ত পর্যন্ত দেড়শো কিলোমিটার জুড়ে প্রতিটি শহর আর রাস্তায় সোলায়মান বাহিনীর সদস্যরা টহল দিয়ে বেড়ায়। শহরগুলোকে পাশ কাটানো কঠিন হবে না, কিন্তু হাইওয়ে বা অন্যান্য রাস্তায় উঠতেই হবে রানাকে, এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঢুকতে হলে রাস্তা পার না হয়ে উপায় নেই।

খানিকটা নিরাপদ হচ্ছে আদিবাসীদের গ্রামগুলো। পাশার বক্তব্য অনুসারে, গেরিলারা সাধারণত ওদেরকে বিরক্ত করে না। জঙ্গলের ভেতর মাঝে মধ্যে রাবার বাগানও পাওয়া যাবে, তবে শ্রমিকদের এড়িয়ে থাকাই ভাল, কারণ ওদের মধ্যেও নাকি সোলায়মানের চর ঢুকে পড়েছে।

গেরিলাদের এড়িয়ে গভীর অরণ্যে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ানো রানার উদ্দেশ্য নয়। দেড়শো কিলোমিটার পরিধির মধ্যে সোলায়মানের ঘাঁটি একার চেষ্টায় খুঁজে বের করাও সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে ও কাপাল পাহাড় পর্যন্ত যাবার পথে ম্যাপে চিহ্নিত আদিবাসীদের গ্রামগুলো দূর থেকে দেখবে, নিরাপদ মনে হলে ভেতরেও ঢুকবে। আঞ্চলিক ভাষা অবশ্য একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। চেষ্টা করে দেখবে মালয়ী ভাষায় ভাব বিনিময় করা যায় কিনা। আদিবাসীরা যদি সোলায়মানের নতুন ঘাঁটি সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে না পারে,

হাইওয়ে বা ছোট কোন শহরে ঢুকে ফাঁদ পাততে হবে ওকে, দু'একজন গেরিলাকে ধরে ইন্টারোগেট করতে হবে।

পাহাড়ে ওঠার পথে উৎকট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল জোঁক। রাকস্যাক থেকে রাশেদের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল রানা, পা বেয়ে উঠে আসা দশ-বারোটা রক্তচোষাকে ছ্যাঁকা দিয়ে খসানো গেল। ওদের বোধহয় রাডার আছে, মানুষের খোঁজ ঠিকই পেয়ে যায়। কখন কিভাবে পা বেয়ে উঠে আসে, সেটাও এক রহস্য। প্রথম দিকে কিছুই বোঝা যায় না—না জ্বালা করে, না চুলকায়। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় ধীরে ধীরে ফুলছে, ওর রক্ত খেয়ে।

প্রথম চারদিন তেমন কোন কঠিন সমস্যায় পড়ল না রানা। আবহাওয়া ভালই, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। প্রতিদিন সকালে, সূর্য ওঠার খানিক আগে, গভীর জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করছে ও, এলিফ্যান্ট ট্রেইল থেকে যতটা সম্ভব দূরে। এখন পর্যন্ত কোন বাঘের সামনে পড়তে হয়নি। দুটো মাত্র পাইথন দেখেছে, রানাকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি।

তেরেনগানা নদী পেরিয়ে এসেছে রানা। নদীর ধারে ছোট একটা শহর। উঁকি দিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারেনি। দোকান-পাট বন্ধ, রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম, ঘর-বাড়ির দোরগোড়ায় সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আশপাশে সোলায়মান বাহিনী ক্যাম্প ফেলেছে ভেবে শহরটাকে ঘিরে দূর থেকে চক্কর দিয়েছে ও। কিন্তু না, গেরিলাদের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি চোখে। ক্যাম্প ফেলেনি, সম্ভবত দু'একজন গেরিলা আশ্রয় নিয়েছে শহরে।

পেটুয়াং নদী পেরুবার জন্যে বাঁশ কেটে ভেলা বানাতে হলো রানাকে। জঙ্গল কেটে এগোচ্ছে আরও দক্ষিণ-পুবে। ওর উদ্দেশ্য কাপাল পাহাড়ে পৌঁছানো। দুই হাজার পাঁচশো বিরানব্বুই ফুট উঁচু ওটা।

রাতে রানা গাছের ওপর ঘুমায়। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মাথার ওপর গাছের পাতা দিয়ে চাঁদোয়া বা ছাতা তৈরি করতে হয় ওকে। রাকস্যাকে টিনে ভরা প্রচুর শুকনো খাবার আছে, খিদে মেটানো কোন সমস্যা নয়। তবে সবই ঠাণ্ডা খেতে হচ্ছে, আগুন জ্বালাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। পানির অভাব মেটাচ্ছে ডাব। মাটিতে পড়ে থাকা ঝুনো নারকেল খিদে মেটাতেও সাহায্য করছে। আর যখন নারকেল গাছ পাচ্ছে না, বাঁশের ভেতর জমা বৃষ্টির পানি খাচ্ছে। রাকস্যাকে লবণ আর অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ট্যাবলেট আছে, প্রতিদিন নিয়মিত খাচ্ছে।

চারদিন পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এমন তুমুল বর্ষণ আগে কখনও দেখেনি কোথাও। আক্ষরিক অর্থেই আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। বৃষ্টি জমিনে বা জঙ্গলের মাথায় এসে পৌঁছুনোর আগেই আওয়াজ ভেসে আসে। শুনে মনে হয় একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে আসছে। জঙ্গল এমনই নিশ্ছিদ্র, বৃষ্টির সমস্ত পানি প্রথম কয়েক মিনিট জমিনে নামতেই পারে না, সব জমা হতে থাকে। তারপর যখন নামে, দেখতে লাগে হাজার হাজার খুদে জলপ্রপাতের মত।

দিনের বেলা ট্রেইল থেকে দূরে থাকে বলে এখন পর্যন্ত রানা কোন হাতি

দেখেনি। তবে আওয়াজ পেয়েছে। প্রতিদিন দুই কি তিনবার ধ্বংসাত্মক ভাঙচুরের শব্দ ভেসে আসে, গাছপালাকে শুইয়ে দিয়ে ছুটে যায় একেকটা পাল। আওয়াজ শুনেই আন্দাজ করতে পারে রানা, পালে অন্তত বিশ-পঁচিশটা করে হাতী আছে।

সাতদিন পর রানা বুঝতে পারল, ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তাদেরকে দেখেও নিয়েছে ও। অসভ্য জংলী আদিবাসী, উলঙ্গ বললেই হয়। প্রথমে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসা ঠাণ্ডা হিম একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করল, কারণ ওদের সঙ্গে বিষ মাখানো তীর আছে। তারপর, রানা সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও, ওরা যখন কাছাকাছি এল না, ভয়টা ধীরে ধীরে কেটে গেল। মালয়েশিয়ার জঙ্গলে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত অনেক জাতের আদিবাসীদের বাস, বেশিরভাগই নিরীহ। অত্যন্ত হিংস্র, এমন কি মানুষ মেরেও নাকি খায়, এমন আদিবাসীও আছে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। একটা সম্প্রদায়ের কথা শুনেছে রানা, শিকারে বেরিয়ে ব্লো-পাইপ ব্যবহার করে। অস্ত্রটা সরু বাঁশ, একপ্রান্ত মুখে পুরে জোরে ফুঁ দিলে খুদে বর্শা ছোটে। ওরা লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, আর একবার লাগলেই, ব্যস, খেল খতম; কারণ বর্শার ডগায় যে বিষ মেশানো থাকে তা নাকি সায়ানাইডের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। তবে এই লোকগুলো স্রেফ কৌতূহলবশত পিছু নিয়েছে, ঝামেলা পাকাবার কোন ইচ্ছা নেই। আবার রওনা হয়ে দেখেও না দেখার ভান করল রানা। এক সময় থেমে গেল তারা, তারপর ফিরে গেল নিজেদের গ্রামে।

আকাশে চাঁদ থাকলে কোন কোন রাতে না ঘুমিয়ে হাঁটল রানা। বেশ কয়েকটা কামপঙকে পাশ কাটাতে হলো। কুকুরগুলো চেঁচামেচি শুরু করলেও, কি ঘটছে দেখার জন্যে গ্রাম থেকে কেউ বেরুল না। তারপর রানা যখন ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল, কুকুর না ডাকায় বুঝতে পারল এদিকে কোন কামপঙ নেই।

তারপর এক ভোরে ঢালের ওপর একটা গ্রামে পৌঁছুল রানা। কামপঙটা সমতল ও পরিষ্কার করা ফাঁকা জায়গার মাঝখানে, একপাশে ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝরনা। পাহাড়ের এত ওপরে কামপঙ খুব কমই দেখা যায়, তাই একটু অবাকই হলো ও। ভেতরে ঢোকার আগে চক্কর দিল সাবধানে। গ্রামটা পরিত্যক্ত। নারকেল গাছের পাতা আর চেচাড়ি দিয়ে তৈরি বেশ কয়েকটা কুঁড়ে দেখা গেল শুধু, ভেতরে কোন আসবাব বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারযোগ্য জিনিস-পত্র নেই। গ্রামবাসীরা যেন তাদের সমস্ত জিনিস-পত্র নিয়ে হঠাৎ অন্য কোথাও চলে গেছে। দিনের আলো আরও একটু পরিষ্কার হতে আকাশে বিপুল মেঘ জমতে শুরু করল। ইতিমধ্যে গোটা গ্রাম ঘুরে দেখা হয়ে গেছে রানার। ভেজার কোন ইচ্ছে নেই, দিনটা একটা কুঁড়েতে কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। মেঘের যে ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে, শুরু হলে এই বৃষ্টি সহজে ছাড়বে না।

রাইফেলটা কাঁধেই থাকল, তবে ওয়ালথারটা হাতে রেখেছে রানা, বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে প্রতিটি কুঁড়ে দেখে নিচ্ছে। দু'একটা কুঁড়েতে ভাঙাচোরা মাটির হাঁড়ি-পাতিল বা বাসন-কোসন দেখা গেল শুধু। ইতিমধ্যে ম্যাপ দেখে নিশ্চিত

হয়ে নিয়েছে ও, এটাই কাপালা পাহাড়। চূড়ার কাছাকাছি এত ওপরে, একটা গ্রাম থাকতে পারে, চিন্তা করে এখনও রানা বিস্মিত। বিশ কিলোমিটার উত্তরে টং নদী, ওদিকে রাবার বাগান আর গ্রাম আছে। পুবে তেলেমং গ্রাম, পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। উত্তর বা পুব, যেদিকেই যাবে রানা, উপকূল পড়বে—দক্ষিণ চীন সাগর। টং নদীর তীর ঘেঁষা গ্রাম বা তেলেমং গ্রাম, দুটোই প্রধান দুই সড়কের কাছাকাছি, কাজেই গোটা বাহিনী নিয়ে ওদিকে দাতো সোলায়মানের না যাবারই কথা। রানার সন্দেহ হলো, রাবার বাগানের শ্রমিকদের দেয়া তথ্যই হয়তো সঠিক, গেরিলারা পেটুয়াং ঘাটি ত্যাগ করে কাপালা পাহাড়ের দিকেই সরে এসেছে। অন্তত পরিত্যক্ত এই গ্রামটা দেখে সেটাই ধরে নিতে হবে। গেরিলাদের আসতে দেখে গ্রামবাসীরা পালিয়েছে।

পাহাড়ের চূড়ায় বা উল্টোদিকে ঢালে ঘাঁটি গেড়েছে সোলায়মান?

বৃষ্টি ধেয়ে এল তরল সাইক্লোন-এর মত। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা রানাকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের মত আঘাত করল ফোঁটাগুলো। ছুটল রানা, গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। এটা সম্ভবত গ্রাম-সর্দারের বাড়ি ছিল। দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না, অবিচ্ছিন্ন একটা জলপ্রপাতের মত লাগছে। ফাঁকা জায়গার অপরপ্রান্তের কুঁড়েগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

রানার খিদে পেয়েছে, কিন্তু সারারাত পথ চলার ক্লান্তি আড়ষ্ট করে তুলেছে শরীরটাকে। পেটে কিছু দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়াটা জরুরী। চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। পরিত্যক্ত গ্রামটাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করলে ভুল হবে, এটা আসলে একটা বিপদসঙ্কেত। কোন কারণ ছাড়া গ্রামবাসীরা পালায়নি। কে জানে, তারা ফিরে আসে কিনা দেখার জন্যে গেরিলারা হয়তো পাহাড়ের চূড়া থেকে এদিকে নজর রাখছে।

বৃষ্টির প্রকোপ ক্রমশ আরও বাড়ছে। খুব বেশি দূরে নয়, জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা গর্জন ভেসে এল। গ্রামের এত কাছাকাছি বাঘ, মানুষখেকোও হতে পারে। আপনমনে হাসল রানা, ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘের পেটে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই ওর নেই।

সিগারেট ধরিয়ে পা থেকে জোঁক খসাল রানা। ঘরের ভেতর আরও অনেক জোঁক রয়েছে, বুট দিয়ে মাড়িয়ে ঘরটাকে নোংরা করতে রুচিতে বাধল, গাছের পাতায় তুলে ফেলে দিল দরজার বাইরে। কাজটা শেষ করে সিধে হতে যাবে, কাছাকাছি জঙ্গল থেকে জোরাল মড়মড় আওয়াজ ভেসে এল। গাছপালা ধরাশায়ী হচ্ছে। জঙ্গলে যাদের চলাফেরার অভিজ্ঞতা আছে, তারা জানে কোন্ শব্দটা বিপজ্জনক, কোনটা বিপজ্জনক নয়। পার্থক্যটা বুঝতে না পারলে একদিনের জঙ্গলবাসই পাগল করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। ওগুলো পচন ধরা প্রাচীন, বুড়ো গাছ, প্রবল বর্ষণের ধকল সহ্য করতে না পেরে কাত হয়ে পড়ছে। প্রাচীন বলেই আকারে ওগুলো বিশাল, শিকড় সহ ভেঙে পড়ার সময় কান ফাটানো আওয়াজ করে, আর গায়ে গায়ে প্রায় লেগে থাকার কারণে আশপাশের গাছগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ধরাশায়ী হয়। পচা একটা গাছ অনেক সময় দশ-বারোটা তাজা গাছকে

মাটিতে শুইয়ে দেয়।

জমাট বাঁধা মেঘ প্রায় স্থির হয়ে আছে, রানা আন্দাজ করল বৃষ্টিটা বিকেলের আগে থামবে না। রাকস্যাক থেকে স্লীপিং ব্যাগটা বের করল। না ঘুমাক, বিশ্রাম নিতে হলেও ওটা দরকার। কাত হলে চোখে তন্দ্রা চলে আসতে পারে, হঠাৎ সেই তন্দ্রা ছুটে গেলে যদি দেখতে পায় মুখের ওপর সাপ বা বিছে উঠে এসেছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে ঘরের ভেতর ঢুকতে পারে ওগুলো।

কাপড়চোপড় খুলে ঘর থেকে বেরুল রানা। গোসল সেরে শুকনো শর্টস পরল, গায়ে এখনও কিছু চড়ায়নি। তখনই কথাটা মনে পড়ল। মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি গজিয়েছে, কামিয়ে ফেলার এখনই সময়। হাতে কাজ থাকলে ঘুমটাকে এড়ানো সহজ। দাড়ি কামানোর পর ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বসবে। শেষ কবে গরম খাবার খেয়েছে মনে করতে পারল না।

রাকস্যাকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম আছে। একটা কাপে বৃষ্টির পানি ভরল রানা। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসল, ছোট্ট আয়নাটা রাখল কুঁড়ের দেয়ালে। পদ্মাসনে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। চোয়ালের একটা দিক কামানো শেষ করেছে, এই সময় আয়নায় কিছু একটা নড়তে দেখল।

প্রথমে মনে হলো ঝাপসা ছায়া। হয়তো দৃষ্টিভ্রম। তবু সতর্ক হয়ে থাকল। হাত অবশ্য থেমে নেই, মুখের অপরদিকটা আস্তে-ধীরে কামাচ্ছে। আয়নায় চোখ, দৃষ্টি যতক্ষণ না মুখের ওপর থাকছে তারচেয়ে বেশিক্ষণ থাকছে দরজার বাইরে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কি দেখেছে, আদৌ কিছু দেখেছে কিনা, নিশ্চিত নয় ও। প্রায় দুই হপ্তা জঙ্গলে একা ঘোরাফেরা করলে নার্ভ ঠিকমত কাজ না-ও করতে পারে। ব্যাপারটা হয়তো দৃষ্টিরই বিভ্রম। দাড়ি কামাবার ফাঁকে বাইরে নজর রাখছে ও। পরনে শুধু শর্টস থাকলেও, কোমরে হোলস্টার রয়েছে। স্টিলেটোর খাপটা বাম বাহুর ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। ঝাপসা ছায়াটা কোন বন্য প্রাণীরও হতে পারে, বাঘের গর্জন শুনে এদিকে পালিয়ে এসেছে। হয়তো কোন কৌতূহলী বানর। কিংবা গ্রামেরই কোন কুকুর, কোন কারণে একা ফিরে এসেছে।

নাকের নিচে নরম মাংসে রেজার চালাচ্ছে রানা, আয়নায় চোখ রেখে তাকিয়ে আছে দরজার বাইরে, এই সময় আবার দেখতে পেল। এবার এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে পরিষ্কারই ধরা পড়ল চোখে। একটা লোক। কম্বল বা নরম চাটাই ধরনের কিছু একটা মাথায় দিয়ে বৃষ্টি ঠেকাচ্ছে, ফাঁকা জায়গাটার অপরপ্রান্তে এক কুঁড়ে থেকে আরেক কুঁড়ের দিকে ছুটছে।

লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল, রানা যে বাড়িতে রয়েছে তার ঠিক সরাসরি উল্টোদিকের একটা বাড়িতে। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে খোলা দরজার সামনে থেকে একটু সরে বসল রানা, গুলি করলে যাতে না লাগে। লোকটা কে হতে পারে ভাবছে। মনে ও মাথায় বিপদসঙ্কেত বেজে ওঠার কথা, কিন্তু বাজছে না। ইন্সটিঙ্কট-এর ওপর আস্থা থাকলেও, সেটা শতকরা একশো ভাগ নয়। গ্রামে একজন লোক আছে, বা ঢুকেছে, কাজেই জানতে হবে কে সে, কি তার উদ্দেশ্য। কুষ্ঠরোগী? গ্রাম ত্যাগ করার সময় গ্রামবাসীরা তাকে সঙ্গে নেয়নি? আদিবাসি

শিকারী? বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয়ের খোঁজে আছে?

গেরিলাদের স্কাউট নয় তো? সোলায়মানের তো খালি একটা গ্রামের ওপরও নজর রাখার কথা। রানা সিদ্ধান্ত নিল, ও যাবে না, লোকটাকে ওর কাছে আসতে দেবে। ধৈর্যের কোন কমতি নেই ওর, সময়েরও নেই কোন অভাব। নাইলন স্লীপিং ব্যাগের ওপর কাত হলো ও, ভেতরে ঢুকল না। শরীরটা লম্বা করে দিয়েছে, খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ব্রাউনিংটা রেখেছে ডান দিকে, সেফটি অফ করা। ওয়ালথার পড়ে আছে বাম দিকে। চোখ প্রায় বুজে ঘুমিয়ে থাকার ভান করল ও।

ভুলটা ওখানেই হলো। ভান করতে গিয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল রানা। একটু পরপরই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল চোখ, প্রতিবার জোর করে খুলতে হচ্ছিল। আসলে বুঝতে পারেনি কতখানি ক্লান্ত। তন্দ্রার ভাবটুকুকে প্রশ্রয় দেয়াই উচিত হয়নি। প্রথমবার ঘুমিয়ে পড়ার পর এক মিনিটও হয়নি জেগে উঠল। নিজেকে তিরস্কার করল ও। খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল, হাতটা রাখল উরুর ওপর। আবার যদি ঘুমিয়ে পড়ে, ছুরির ফলা উরুর মাংস স্পর্শ করবে।

বেশ কিছুক্ষণ জেগেই থাকল, আসলে আহত হবার ভয়টা জাগিয়ে রাখল ওকে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দ্বিতীয়বারও নিজের অজান্তে ঘুম চলে এল চোখে। ছুরিটা শক্ত মুঠোর ভেতর ধরা আছে, ঘুমিয়ে গেলেও মুঠোটা পুরোপুরি আলগা হয়নি। ইতিমধ্যে কখন যেন বৃষ্টি অনেকটাই ধরে এসেছে। আওয়াজের পরিবর্তন জাগিয়ে দিল ওকে। ঘুম ভাঙলেও নড়ল না রানা, এমন কি চোখও খুলল না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করে দিয়েছে। চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক করল, অত্যন্ত সাবধানে। কিন্তু দরজাটা পরিষ্কার হচ্ছে না! যেখানে দরজা থাকার কথা সেখানে অন্য কিছু রয়েছে। আরও একটু খুলতে হলো চোখ। একটা মেয়ে! দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সন্ত্রস্ত, বিপদের গন্ধ পাওয়া চঞ্চলা হরিণীর মত, পালাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। সস্তা বাটিকের পাতলা আধখানা সারং পরে আছে, শরীর বা যৌবন কিছুই ঠিকমত ঢাকা পড়েনি। বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভিজে গেছে, তাসত্ত্বেও অসংখ্য সাপের মত মুখ আর মাথার তিনদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ঘন কালো চুল। এ যেন সেই রূপকথায় বর্ণিত রাজকন্যা, অরণ্যে নির্বাসিত পরমাসুন্দরী। রানার মনে হলো, এখনও বোধহয় ওর ঘুম ভাঙেনি, স্বপ্ন দেখছে। ভেজা চুল নেমে এসেছে কাঁধের দু'পাশ থেকে, উজ্জ্বল বাদামী রঙের উন্নতসুডৌল স্তন জোড়া তাতেও ঢাকা পড়েনি পুরোপুরি। রানা মেয়েটার বয়েস আন্দাজ করল বাইশ থেকে সাতাশের মধ্যে।

দু'জনের মধ্যে একটা খেলা শুরু হলো। মিছিমিছি নাক ডাকার ভান করল রানা, দুর্বোধ্য আওয়াজ করল দু'একটা, যেন ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। মায়াবিনী বনদেবীর সাহস বেড়ে গেল। ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকে পড়ল সে, সরাসরি টিন ভর্তি খাবারগুলোর দিকে ছুটে এল। মেয়েটা খিদেতে মরে যাচ্ছে।

ঝুঁকল সে, ছেঁড়া সারংটাকে থলে বানিয়ে খাবার টিনগুলো ভরছে তাতে। মালয়ী মেয়েদের তুলনায় অস্বাভাবিক লম্বা সে, পা দুটো সুগঠিত, ভরাট নিতম্ব।

পিঠ চওড়া হলেও কোমরটা সরু।

শান্তভাবে উঠে বসে ওয়ালথারটা তার দিকে তুলল রানা। 'ওগুলো রেখে দাও,' মালয়ী ভাষায় বলল। 'খিদে পেলে খাবে, চুরি করার দরকার নেই।'

ঝট করে সিধে হলো মেয়েটা, গলা থেকে আর্ত একটা আওয়াজ বেরুল। সারং থেকে খসে পড়ল সবগুলো টিনের কৌটা, মেঝেতে গড়াতে শুরু করল। সাদা দাঁত দেখিয়ে নরম হাসি হাসছে রানা, মেয়েটা ওকে যাতে অশুভ আত্মা বা ভূত বলে মনে না করে। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ গ্রামবাসী এ-সবে বিশ্বাস করে। দু'পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা, বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ভয় পেয়েছে, বুঝতে পারল রানা, তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েনি। পেশী টান টান হয়ে আছে, সতর্ক। অপেক্ষা করছে। বুঝতে চায় রানার উদ্দেশ্যটা কি।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, পিস্তল ধরা হাতটা শরীরের পাশে, মুখে হাসি। 'আপা নামা?' মালয়ী ভাষায় জানতে চাইল।

'বৈশাখি নামা।' মুখে হাসি নেই। ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে উঠল। মাথা একটু কাত করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মাথা দোলাল রানা। 'বৈশাখি? বাহ্, নামটা তো খুব সুন্দর। তা বৈশাখি, তুমি একা কি করছ এখানে? নির্জন, পরিত্যক্ত একটা গ্রামে?'

'বানিয়াক সুসা,' জবাব দিল মেয়েটা। বলতে চাইছে, এদিকে মারাত্মক অঘটন ঘটে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রানা উপলব্ধি করল, সোনার একটা খনি পেয়ে গেছে ও—প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। অবশ্য পরমুহূর্তেই নিজেকে নিঃস্ব মনে হলো।

আকস্মিক আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল বৈশাখির চোখ, হাত তুলে রানার পিছনটা দেখাল, উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আদাউলার বেসার!'

সেই সুপ্রাচীন চালাকি, রানা প্রায় ধরা খেয়েও যাচ্ছিল। মুশকিল হলো, ব্যাপারটা চালাকি না-ও হতে পারে, হয়তো সত্যি সত্যি ওর পিছনে ফণা তুলেছে বিষাক্ত একটা সাপ।

ক্ষিপ্রবেগে ছুটল বৈশাখি দরজার দিকে। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েও পড়ল, কিন্তু দোরগোড়া থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরল রানা। পিচ্ছিল একটা খুদে পাইথনের মত ধস্তাধস্তি শুরু করল মেয়েটা, সেইসঙ্গে দাঁত দিয়ে রানাকে কামড় দেয়ার চেষ্টা করছে। রানা তাকে ছাড়বে না, সে-ও নিজেকে মুক্ত করবে। কিভাবে যেন তার গা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল সারংটা। তাতেই কাজ হলো। যে-ই বুঝতে পারল সে বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে, ধস্তাধস্তি বন্ধ করে গুটিয়ে উঠল, সামনের দিকে ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে বুক আর নাভির নিচেটা চট করে ঢেকে ফেলল। টান দিয়ে ঘরের এক কোণে ঠেলে দিল তাকে রানা, সরাসরি তাকাচ্ছে না। 'শান্ত হও, বোকা মেয়ে,' বলল ও। তারপর সাপের খোঁজে তাকাল। নেই।

ছেঁড়া সারংটা মেঝে থেকে তুলে বৈশাখির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। ঝট করে সেটা আবার পরে ফেলল সে। রাকস্যাক খুলে শুকনো একটা শার্ট বের করল রানা, সেটাও ছুঁড়ে দিল। ওর দিকে পিছন ফিরে শার্টটা পরল বৈশাখি।

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে রানা, বাইরেটা চট করে একবার দেখে নিল।

চমকে উঠল বৈশাখির গলা শুনে। কি আশ্চর্য, মেয়েটা ইংরেজি জানে!

'আপনি বিদেশী?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

বৈশাখির হাসি মেঘলা দিনটাকে আলোকিত করে তুলল, অন্তত ঘরের ভেতরটাকে। 'বিদেশী হলেও আপনি থাই বা চীনা নন, কাজেই আপনাকে না পেলেও বোধহয় চলে আমার। তবু আপনার জবান থেকে শুনতে চাই কথাটা—আপনি কি খারাপ মানুষ?'

হেসে ফেলল রানা। 'না। পাজি লোক ছাড়া কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে খারাপ লোক বলেনি।'

'বৈশাখিকে আপনি খাবার আর সিগারেট দেবেন?'

সিগারেটে কষে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বৈশাখি। পদ্মাসনে রানার সামনে বসে আছে, একটা হাত ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর। রানার চোখে কৌতূহল। মাপমত দামী পোশাক পরিয়ে এশিয়ার যে-কোন দূতাবাসের ড্রইংরূমে বসিয়ে দিলে বিদেশী কূটনীতিকরা মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারবে না। মালয়েশিয়ায় প্রচুর তামিল হিন্দু আর চীনা আছে, বৈশাখির শরীরে তাদের রক্ত মিশেছে বলে মনে হলো না—সম্ভবত একশো ভাগ মালয়ী। আর সুন্দরী মালয়ী তরুণীদের স্বর্গের অপ্সরা বলে মনে করা হয়।

বৈশাখির সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য হলো, এ-ব্যাপারে সে সচেতন নয়।

একটা ক্যান ওপেনার ছুঁড়ে দিল রানা। 'টিনে নানা রকম খাবার আছে, যত খুশি খেতে পারো তুমি। আমারও খিদে লেগেছে। হোক গ্রাম্য বা পাহাড়ী, একটা মেয়ের সামনে খালি গায়ে থাকতে ভব্যতা বোধে বাধছে রানার। শর্টস পরে থাকতেও খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছে। ট্রাউজার বের করে পরল, গায়ে দিল আধ ভেজা শার্ট। চোখ থেকে ঘুম আগেই উধাও হয়ে গেছে।

রানা লক্ষ করল, মেয়েটা ক্যান ওপেনার ব্যবহার করতে জানে। দরজার বাইরে তাকিয়ে রানাকে বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে কাঠ বা কয়লা যোগাড় করা সম্ভব নয়। ঠাণ্ডা খাবার খেতে হবে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'চুরি করতে পারলে তো ঠাণ্ডাই খেতে।'

তির্যক দৃষ্টি হেনে বৈশাখি বলল, 'খিদে না পেলে বৈশাখি চুরি করতে আসত না। বৈশাখি অসৎ মেয়ে নয়।'

'শুনে ভাল লাগল।'

বিস্কিট আর পনির খেলো ওরা। খাবার সময় গল্পটা শোনাল বৈশাখি। কাল রাতে গ্রামে ফিরে এসেছে সে। তার আগে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ব্যাপারটা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। বৈশাখির কথাবার্তা এলোমেলো, আগেরটা পরে, পরেরটা আগে বলছে, ফলে মেলাতে সমস্যা হচ্ছে রানার। এক সময় তাকে থামতে বলে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল ও। ওর মালয়ী কোন রকমে কাজ চালাবার মত, বৈশাখির ইংরেজিও তাই। তবে দু'জনের আন্তরিকতা আর আগ্রহ ভাব বিনিময়ে সহায়তা করল।

বৈশাখির পুরো বা আসল নাম আব্বাসী সুলতানা। ওর আব্বুর আব্বু, অর্থাৎ দাদার নাম জয়নাল আব্বাসী। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। পরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও লড়েছেন। রণ ক্লান্ত জয়নাল আব্বাসী হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করেন, যুদ্ধ তাঁর ভাল লাগছে না। কাউকে কিছু না বলে প্রথমে সমতল ভূমিতে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তারপর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে আসেন এই কাপালা পাহাড়ে। কাপালা পাহাড়ে যেহেতু কোন লোকবসতি ছিল না, চারদিকে শুধু দুর্গম জঙ্গল, তাঁর মনে হয় বাকি জীবনটা এখানে শান্তিতে কাটাতে পারবেন।

প্রথম দিকে নিজেদের তৈরি গ্রামটা একদম ছোট ছিল। জয়নাল আব্বাসী এক ছেলে নিয়ে এসেছিলেন এখানে, পরে তার আরও দুই ছেলে আর তিন মেয়ে হয়। মেয়েদের বিয়ে দেন তিনি, তাঁর শর্ত মেনে নিয়ে জামাইরাও এই পাহাড়ী গ্রামে ঘর বানিয়ে সাংসারিক জীবন শুরু করে। তারপর ছেলেদের বিয়ে হয়। এভাবে লোকসংখ্যা বাড়ে, তার সঙ্গে বাড়ে গ্রামের পরিধি। পাহাড়ের গায়ে বিচ্ছিন্ন একটা গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও কঠিন, বিশেষ করে এমন একটা গহীন জঙ্গলে যেখানে বর্বর আদিবাসীদের রাজত্ব। বৈশাখির বাপ-চাচারা চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দুর্গম পথ পেরিয়ে শহরগুলোয় আসা-যাওয়া শুরু করে। জঙ্গলের ফল, বিশেষ করে নারকেল, শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত তারা, সেই টাকা দিয়ে কিনে আনত ওষুধ, তৈজস-পত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদি। শহরে কিছু লোকের সঙ্গে খাতির হলো তাদের, বেশিরভাগই গরীব বা বেকার। ওদের গ্রামে আসা-যাওয়া শুরু করল তারা, কেউ কেউ এখানে থেকেও গেল। এভাবে শহরবাসীরা এই গ্রামের কথা জানতে পারল। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল জয়নাল আব্বাসীর দুঃস্বপ্নের কথাটাও।

বৃদ্ধ জয়নাল আব্বাসী মাঝে মধ্যে স্বপ্নটা দেখতেন। দেখার সময়, ঘুমের মধ্যে, কথা বলতেন তিনি। 'সোনা! সোনা!' বলে চিৎকার করতেন। বলতেন, 'মাক্কিম্যানরা সব নিয়ে গেল! সর্বনাশ হয়ে গেল! মাক্কিম্যানরা সব নিয়ে গেল! সাবমেরিন একবার ডুব দিলে আর ওদেরকে ধরা সম্ভব নয়!' কিন্তু, আশ্চর্যই বলতে হবে, ঘুম ভাঙার পর তিনি বলতে পারতেন না কি স্বপ্ন দেখেছেন। এমন কি তিনি যে ঘুমের মধ্যে কথা বলেছেন, তা-ও মনে করতে পারতেন না। অন্তত সবার কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে এই উত্তরই দিতেন তিনি।

গল্পটার তাৎপর্য ভাল করে বোঝার জন্য বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করল রানা, আর ওর প্রতিটি প্রশ্ন শোনা মাত্র গল্পটা আবার নতুন করে বলতে শুরু করল বৈশাখি, নিজস্ব ঢঙে। ধৈর্য হারাবার উপক্রম হলেও, বিরক্তি চেপে রেখে শুনতে হলো ওকে।

জয়নাল আব্বাসীর বয়েস যত বাড়তে লাগল, স্বপ্নের সংখ্যা তত কমতে লাগল। একটা সময় এল, তাঁর চিৎকারে রাতে আর গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙে না। মানুষ স্বপ্নটার কথা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে শুরু করল। অবশ্য গ্রামের বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাস করত না যে লুকানো সোনা সম্পর্কে বৃদ্ধ সত্যি সত্যি কিছু জানে।

তারপর, মাত্র কয়েক মাস আগে, এলাকায় সোলায়মান বাহিনীর উপদ্রব শুরু

হলো। গেরিলা ট্রেনিং দেয়ার জন্যে নতুন লোক দরকার তাদের। প্রথমে তারা আদিবাসীদের ধরে আনল, জোর করে ট্রেনিং দেবে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল। পালাতে গিয়ে গেরিলাদের গুলি খেয়ে মারাও পড়ল অনেক লোক।

জয়নাল আব্বাসীর সেই দুঃস্বপ্ন আবার ফিরে এল।

চেয়ে নিয়ে একটা করে সিগারেট ধরাচ্ছে বৈশাখি, প্রচুর সময় নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে তার কাহিনী। বৃষ্টিটা আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। হাতে কোন কাজ নেই, কাজেই তাগাদা না দিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে রানা। মাঝে মধ্যে মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলছে, তবে বৈশাখি সেটা খেয়াল করছে বলে মনে হলো না।

'তারপর, পরদেশী, আমি একটা বড় ধরনের ভুল করে বসলাম,' বলল বৈশাখি। 'একদিন বোকার মত আমার মনের মানুষকে দাদুর স্বপ্নটার কথা বলে ফেললাম। আর সেটাই হলো কাল। দাদু, বাপ-চাচা, খালা-মামা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে হারাতে হলো। আর সেজন্যে দায়ী এই বৈশাখিই। কিন্তু আপনিই বলুন, কিভাবে জানব আমি যাকে ভালবাসি সে আসলে দাতো সোলায়মানের একজন গেরিলা? কি করে জানব আমার মুখে শুনে সোলায়মানকে স্বপ্নটার কথা বলে দেবে সে?'

রানার কান দুটো যেন আক্ষরিক অর্থেই খাড়া হয়ে উঠল। 'কে কাকে কি বলল?'

'ওহ্, পরদেশী!' অসহায় একটা ভঙ্গি করল বৈশাখি। 'বাম হাতের দুই আঙুল দিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুলের মাথা ধরল সে। 'আমি একজনকে ভালবাসতাম, এটা তো বুঝতে পারছেন?'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'তার নাম নেয়ামত, ঠিক আছে?' দ্বিতীয় আঙুল ধরল বৈশাখি।

'কিন্তু বৈশাখি যখন গল্পটা শোনাল তখন সে জানত না যে নেয়ামত গেরিলা দলে নাম লিখিয়েছে। প্রচুর সোনার গল্প–দুঃস্বপ্ন, বুঝতে পারছেন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এক রাতে, জঙ্গলের ভেতর, পরস্পরকে ভালবাসলাম আমরা। তারপর আমি স্বপ্নটার কথা তাকে বললাম। সে হাসল। বৈশাখি হাসল। এরপর দুই কি তিন হপ্তা এ-প্রসঙ্গে আর কোন কথা হয়নি আমাদের মধ্যে।'

'তারপর?' জানতে চাইল রানা। 'দুই কি তিন হপ্তা পর তুমি জানতে পারলে নেয়ামত গেরিলা? সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে?'

নিভে যাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল বৈশাখি। রানার মনে হলো মেয়েটা কেঁদে ফেলবে। শব্দ করল না, পানি ভরা চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, পরদেশী, আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো রানার। 'টের পেলে নেয়ামত গেরিলাবাহিনীর লীডার সোলায়মানকে গ্রামে আনার পর, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল বৈশাখি। 'প্রথমে তারা দাদুকে খুব খাতির করল। অনুরোধ

করল, কোথায় কতটুকু সোনা আছে বলতে পারলে দাদুকে তারা অনেক কিছু উপহার দেবে। দাদুর বয়েস নব্বুই ছাড়িয়ে গেছে, তিনি বললেন সোনা-টোনার কথা কিছুই তাঁর মনে নেই। খেপে গিয়ে সোলায়মান বলল, শালা বুড়ো, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাও না! মনে না পড়লেও মনে করতে হবে। গেরিলাদের সোনা দরকার, তা না হলে রসদ যোগাড় করা যাবে না। সোলায়মান আরও বলল, বুড়ো শালা, তুমি তো নিজেও গেরিলা ছিলে–জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়েছ, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছ, কাজেই তোমার মত পুরানো একজন পাপী সোনার কথা ভোলে কিভাবে? তাড়াতাড়ি একটা ম্যাপ এঁকে দাও, ম্যাপে দাগিয়ে দেখাও কোথায় পাওয়া যাবে সেই সোনা। কিন্তু আমার দাদু তারপরও বললেন, তাঁর কিছু মনে পড়ছে না। আরও বললেন, তিনি যুদ্ধ করেছেন একটা আদর্শের জন্যে, আর সোলায়মান যুদ্ধ করছে বিদেশীদের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে, কাজেই তাকে তিনি কোনভাবে সাহায্য করতে রাজি নন।

'এরপর ওরা আমার দাদুকে বেঁধে ফেলল। উলঙ্গ করে বুড়ো মানুষটাকে অপমান করল, কষ্ট দিল গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে।'

মাঝে মধ্যেই নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে যাচ্ছে রানা। মনে মনে চাইছে বৈশাখি যেন না থামে। কিন্তু মুখ বন্ধ করে হাত পাতল সে, আরেকটা সিগারেট চাইছে। সিগারেট দিয়ে আবার শুরু করার তাগাদা দিল ও। 'তারপর কি হলো? তোমার দাদুকে নির্যাতন করল ওরা, গ্রামের সবাইকে তা দেখতে বাধ্য করা হলো। অবশেষে তোমার দাদু সব কথা বলে দিলেন? ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় পাওয়া যাবে সেই সোনা?' গুপ্তধন বা লুকানো সোনার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না ও, আবার সবটুকু অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বৈশাখি যদি মিথ্যে কথা না বলে, ধরে নিতে হবে সোলায়মান দুঃস্বপ্ন আর সোনার কথা বিশ্বাস করেছিল। এটুকু জানাই রানার জন্যে যথেষ্ট। সোনা থাক বা না থাক, সোলায়মান আছে বলে বিশ্বাস করলে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরিয়েছে। এখন শুধু জানতে পারলেই হয় কোন দিকে গেছে সে।

ধোঁয়া ছেড়ে রানার দিকে তাকাল বৈশাখি, চোখ বড় বড় করে। এখন আর তার চোখে পানি নেই। 'হ্যাঁ, পরদেশী। নির্যাতন অসহ্য হয়ে উঠল। দাদুকে ভয় দেখানো হলো স্লীপিং ব্যাগে ভরে কুয়ায় ফেলে দেয়া হবে তাকে। হ্যাঁ, ভয়ে তিনি মুখ খুললেন। সোলায়মানকে একটা ম্যাপও এঁকে দিলেন। বলে দিলেন কোথায় পাওয়া যাবে সেই সোনা।'

'কোথায় পাওয়া যাবে, বৈশাখি?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাবমেরিনে। পুরানো একটা জাপানী সাবমেরিন, বহু কাল আগে ডুবে গেছে। দাদু ওদেরকে বললেন, বৈশাখি তার নিজের কানে শুনল।'

কি ধরে নেয়া উচিত বুঝতে পারছে না রানা। চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, তখনকার কোন জাপানী সাবমেরিনে সোনা আসবে কিভাবে? আর যদি থাকেও, ডোবা একটা সাবমেরিন এতদিন পর কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? নাকি গোটা ব্যাপারটাই বৈশাখির বানানো গল্প? বানিয়ে বলে থাকলে মেয়েটা মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী। কিন্তু কেন সে মিথ্যে কথা বলবে?

আবার প্রশ্ন তুলল রানা, ফ্যান্টাসী আর ফ্যাক্ট আলাদা করতে চাইছে। 'জাপানীদের এই সাবমেরিনটা কোথায় ডুবেছে, বৈশাখি?'

মাথা নাড়ল বৈশাখি। 'তা বৈশাখি কিভাবে জানবে! বৈশাখি কি তখন কামপঙের ভেতর ছিল।'

'ম্যাপ তাহলে সত্যি একটা আঁকা হয়েছে?' গলার আওয়াজ একটু কঠিন করল রানা। 'ঠিক জানো?'

'বৈশাখি মিথ্যে কথা বলে না, পরদেশী। তার মাথাতেও কোন গণ্ডগোল নেই।'

দুর্বোধ্য কারণে ব্যাপারটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে রানা। সিদ্ধান্ত নিল, বৈশাখিকে পরীক্ষা করবে। 'তারপর কি হলো? তোমার দাদু এখন কোথায়? গ্রামের আর সব মানুষ?'

'দাদু মারা গেলেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বৈশাখির প্রিয় দাদু চলে গেলেন। যে দাদু বৈশাখিকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন।'

'লাশটা কোথায়, আমাকে দেখাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর গ্রামবাসীরা? তারা কোথায় পালাল?'

ঝট করে সিধে হলো বৈশাখি। 'পরদেশী, সহ্য করতে পারবে তো? যদি পারো, এসো আমার সঙ্গে।' চিবুক নেড়ে দরজার দিকটা রানাকে দেখাল। 'শুধু দাদুকে কেন, সবাইকে দেখতে পাবে।'

রানা নড়ল না। 'সবাইকে মানে?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বৈশাখি। হঠাৎ ছুটে এসে রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে চওড়া পিঠ। কি করবে বুঝতে না পেরে প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে থাকল রানা, তারপর ইতস্তত একটা হাত তুলে বৈশাখির পিঠে বুলাল। 'শান্ত হও, বৈশাখি। বুঝতে পারছি, খুব মারাত্মক কিছু ঘটেছে। চলো, দেখি।'

'পরদেশী, তুমি এখনও কিছু বুঝতে পারোনি!' কান্না থামিয়ে রানাকে ছেড়ে দিল বৈশাখি, এক পা পিছিয়ে গেল। 'সবাই মানে সবাই। বৈশাখির সমস্ত আপনজন। গ্রামের একজনকেও ওরা রেহাই দেয়নি। দাদু ম্যাপ এঁকে দিয়েছে, এই কথাটা সরকারী বাহিনী যাতে জানতে না পারে, তাই ওরা একজনকেও বাঁচিয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ব্যাপারটা নিয়ে উঁচু গলায় সবার সামনে প্রকাশ্যেই আলোচনা করল। বলল, আগে হোক বা পরে, সরকারী বাহিনী এদিকে আসবে। তখন যদি জানতে পারে ম্যাপ ধরে সোনা খুঁজতে গেছে ওরা, সরকারী বাহিনী ওদের পিছু নেবে। কাজেই গ্রামের সবাইকে মেরে ফেলা হলে সরকারী বাহিনীর কাছে মুখ খোলার কেউ থাকবে না। এখনও ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না?' অধৈর্য দেখাল তাকে।

কথা শেষ করে দরজার দিকে এগোল বৈশাখি। ব্রাউনিংটা হাতে নিয়ে তাকে বাধা দিল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি নয়, বৈশাখি। আমি জানব কিভাবে বাইরে সোলায়মানের লোকজন অপেক্ষা করছে না?'

সরু কোমরে দু'হাত রেখে সরাসরি তাকিয়ে শান্ত গলায় বৈশাখি বলল,

'এখন আর এদিকে কোন গেরিলা নেই। তারা সবাই জাপানী সাবমেরিন থেকে সোনা তুলতে গেছে। খাবারের খোঁজে ওদের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম, কাজেই আমি জানি। খাবার না পেয়ে এখানে ফিরে আসি।'

'কেন ফিরে আসো? তুমি তো জানতেই গ্রামে কেউ নেই। এ-ও জানতে গেরিলারা গ্রামে কিছু রাখেনি, সব নিয়ে গেছে।'

'ভেবেছিলাম ফিরে এসে দেখব সরকারী বাহিনী পৌঁছে গেছে, তারা আমাকে খেতে দেবে, সঙ্গে করে উপকূলের দিকেও নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা আসেনি। অথচ বৈশাখির প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। সেজন্যেই আপনার কাছ থেকে খাবার চুরি...এখন কি আমরা বেরুতে পারি?'

বৃষ্টি নেই, বৈশাখির পিছু নিয়ে কুঁড়েটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। মেয়েটার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলেও পুরোমাত্রায় সতর্ক। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে এল ওরা, পথ দেখাচ্ছে বৈশাখি। গ্রাম থেকে বের হয়ে এসে পিচ্ছিল একটা লগ-এর ওপর দিয়ে ঝরনাটা পার হলো। মেয়েটাকে গেরিলাদের ফেলা টোপ বলে সন্দেহ করতে পারছে না রানা। কোন যুক্তি নেই। তারা যদি জানে কামপঙে আছে ও, টোপ ফেলার দরকার কি, সরাসরি এসে ধরলেই তো পারে।

জঙ্গলে ঢোকার পর সামনে কি দেখতে পাবে আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। দুর্গন্ধটা সহ্য করার মত নয়। বৈশাখি আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরল। রানা রুমাল বাঁধল মুখে। মৃত্যুর গন্ধ আগেও পেয়েছে ও, তবে এরকম নয়। এ যেন এক হপ্তার পুরানো কোন যুদ্ধক্ষেত্র, লাশগুলো রোদে পচার জন্যে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে।

সরু ও গভীর একটা নালার কিনারায় পৌঁছে থামল ওরা। একটা কুয়া থেকে গন্ধ উঠে আসছে গ্যাস ভরা বুদ্বুদের আকৃতি নিয়ে। হাত তুলে দেখাল বৈশাখি। 'ওই দেখুন। যা বলছিলাম। গ্রামের সবাইকে এখানে এনে গুলি করে মারে ওরা, তারপর ওই কুয়ায় ফেলে দেয়। গেরিলারা যখন কামপঙে ঢোকে, আমি তখন জঙ্গলে ছিলাম। আড়াল থেকে দেখি দাদুকে ওরা মেরে ফেলছে। তাই আর ভেতরে ঢুকিনি। তারপর গ্রামের সবাইকে মার্চ করিয়ে এখানে এনে গুলি করে।'

কুয়ায় যখন লাশ ফেলা হয়, ভেতরে তখন খুব বেশি পানি ছিল না। লাশ ফেলার পর মাটি দিয়ে কুয়ার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তুমুল বৃষ্টিতে সে মাটি ধুয়ে গেছে, কুয়াটাও পানিতে ভরে উঠেছে। লাশগুলো বেশিরভাগই নালার স্রোতে ভেসে গেছে, তবে ঢালের গায়ে এখনও বিশ-বাইশটা পড়ে আছে। এখানে জঙ্গল এত ঘন, আকাশ থেকে কোন পাইলট নিচে তাকালেও কিছু দেখতে পাবে না। পাঁচ-সাতটা শূকর দেখা গেল, পচা লাশ খাচ্ছে। এত ব্যস্ত, ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। রানার বমি পেল। নালা আর কুয়ার দিকে পিছন ফিরল ও।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা। দু'জোড়া চোখ একই সময়ে পরস্পরকে দেখতে পেয়েছে, প্রতিক্রিয়াও হলো প্রায় একই ধরনের। রানা স্থির হয়ে গেল, আরও শক্ত করে ধরল ব্রাউনিংটা। 'বৈশাখি, এক চুল নড়বে না!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল ও। রানাকে দেখেই আড়ষ্ট

হয়ে গেছে বাঘ, তারপর নিচু হলো সে, লাফ দেয়ার জন্যে আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলল। রানার চোখে পলক পড়ছে না। ভাবছে, আজ ভোরে সম্ভবত এই বাঘটাকেই ডাকতে শুনেছে। এটা বোধহয় ওটার দ্বিতীয়বার লাশ খেতে আসা। মাত্র বিশ-বাইশ হাত দূরে, লাফ দিলে গুলি করার জন্যে দু'সেকেন্ডের বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

অকস্মাৎ গগনবিদারী একটা গর্জন ছেড়ে পিছন ফিরল বাঘ, এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল বৈশাখি।

তিন

বাঘটা যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে চলে এল রানা, দু'হাতের ভাঁজে বৈশাখি। ডান হাতের মুঠোয় ওয়ালথার ধরে আছে, ব্রাউনিংটা ঝুলছে কাঁধের সঙ্গে।

এক দেড়শো গজ হেঁটে এসে ভেজা ও নরম গাছের পাতার ওপর বৈশাখিকে শুইয়ে দিল। মুখে পানির ছিটে দিতেই চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা। তারপর ঝট করে উঠে বসে একেবারে হিন্দুয়ানি কায়দায় দু'হাত এক করে কপালে ঠেকাল। 'মহাশয়কে সালাম,' মালয়ী ভাষায় বলল সে, চেহারায় শ্রদ্ধা ও সমীহ।

বুঝতে না পেরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মানে? হঠাৎ?'

'আপনাকে নয়, পরদেশী,' বলল বৈশাখি। 'সালাম-দিলাম রিমাউকে।'

'রিমাউ?' মালয়ী ভাষায় শব্দটার মানে রানার জানা নেই।

'দেখলেন না, আপনাকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে গেল?' অবাক হয়ে বলল বৈশাখি। 'ওরাই তো আমাদের জঙ্গলের রাজা। আমাকে চেনে কিনা, আপনাকে আমার সঙ্গে দেখে তাই কিছু বলল না।'

'রিমাউ তোমাকে চেনে, আর তাই আমাকে খেলো না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার ঠোঁটে হাতচাপা দিল বৈশাখি। 'সাবধান! বারবার মশাইদের নাম উচ্চারণ করতে নেই! শুনতে পেলে চলে আসবে।'

অন্য কোন পরিস্থিতিতে হেসে ফেলত রানা। জিজ্ঞেস করল, 'এখন তুমি সুস্থ বোধ করছ তো?'

উত্তরে দাঁড়িয়ে পড়ল বৈশাখি। 'চলুন।'

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। রানার পেটের ভেতরটা এখনও মোচড় খাচ্ছে, কপালের দু'পাশ দপদপ করছে, চোখ দুটো আগুনের মত গরম। সোলায়মানের প্রতি অন্ধ একটা আক্রোশ অনুভব করছে ও। ক্যাম্পে ফেরার পথে বৈশাখিকে জিজ্ঞেস করল, 'সোলায়মানের সঙ্গে ক'জন ছিল ওরা?'

'এক দেড়শো হবে, বৈশাখি গুনে দেখেনি।'

'যে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে তারা, সেটা কত বড়?'

'অনেক বড়। পাঁচশো লোক থাকার মত।'

'সোলায়মানের বাহিনীতে তাহলে পাঁচশোর মত গেরিলা আছে?'

মাথা নাড়ল বৈশাখি। 'আরও বেশি। তবে শুনেছি, মূল দলটা থাই সীমান্তের দিকে অপারেশন চালায়। দাতো সোলায়মান এক-দেড়শো লোক নিয়ে ঘোরাফেরা করে।'

কুঁড়েটায় ফিরে এসে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাকস্যাকে ভরল রানা। ইতিমধ্যে রাগটাকে দমিয়ে আনতে পারলেও, মনের ভেতর ধিকিধিকি একটা আগুন জ্বলছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, দাতো সোলায়মানকে খুন করতে না পারলে সেই আগুন নিভবে না।

তবে এ-ও জানে, সোলায়মানকে খুন করাটাই সমস্যার সমাধান নয়।

মেয়েটা অদ্ভুত চরিত্রের, মাঝে মধ্যে এমন সব প্রশ্ন করে বসে! 'পরদেশী, সত্যি কথা বলবে, আমি সুন্দর না?'

'হ্যাঁ।' অন্যমনস্ক রানা। 'খুব সুন্দর।'

'আর তাছাড়া, বৈশাখিকে বিশ্বাসও করা যায়, ঠিক?'

'কি বলতে চাও, বৈশাখি?' ব্রাউনিং আর ওয়ালথার চেক করছে রানা। ছুরিটা রেখেছে বাহুর ওপর খাপে।

'আপনি জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলেন,' বলল বৈশাখি। 'তারমানে রওনা হবেন।'

'হ্যাঁ।' কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে উঠানে নামার ধাপে বসল রানা, চিন্তা করছে। সোলায়মান তার বাহিনী নিয়ে উপকূলের দিকে গেছে। সঙ্গে কমবেশি দেড়শোর মত লোক থাকলেও, সবাইকে নিয়ে সোনা খুঁজতে যাবে বলে মনে হয় না। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুব বেশি হলে পঞ্চাশজনকে সঙ্গে রাখবে সে, বাকি লোকগুলোকে অন্য কোন অপারেশনে পাঠাবে বা কোথাও অপেক্ষা করতে বলবে। সরকারী বাহিনী আসতে পারে, এটা চিন্তা করেই গ্রামে আগুন ধরায়নি সে। আগুন মানেই তো ধোঁয়া, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। গ্রামের সব জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলার কারণ হলো দেখে যাতে লোকে ভাবে গ্রামবাসীরা ভয়ে হোক বা অন্য কোন কারণে কোথাও সরে গেছে। লাশগুলো যে কুয়া থেকে ভেসে উঠবে, এই চিন্তাটা তার মাথায় খেলেনি। আরও একটা ভুল করে গেছে সে—জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বৈশাখিকে খুঁজে বের করেনি। গ্রামবাসীকে খুন করার আগে জেরা করলেই মেয়েটার কথা জানতে পারত সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাশেটিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল বৈশাখি। 'চিন্তা করার কিছু নেই, পরদেশী। আপনি আগে থাকুন, বৈশাখি আপনার পিছনে থাকবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। 'কি বললে?'

কফি রঙের চোখ বড় বড় করে বৈশাখি বলল, 'আপনি তো সোলায়মানের পিছু নেবেন, তাই না? আমি পথ না দেখালে সে কোনদিকে গেছে আপনি জানবেন কিভাবে? সে গেছে জাপানী সাবমেরিনের খোঁজে, উপকূলের দিকে। আপনিও সেদিকে যাবেন, তাই না? আমাকেও তো ওদিকে যেতে হবে, পরদেশী। লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তাদের সাহায্য নিতে হবে, তা না হলে

বৈশাখি আশ্রয় পাবে কোথায়?'

নিরেট বাস্তব চিন্তা। ঠিকই তো, একা এখানে কিভাবে থাকবে বৈশাখি। সরকারী বাহিনী কবে আসবে, আদৌ আসবে কিনা, তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই এখানে মেয়েটাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া রানার পক্ষেও সম্ভব নয়। 'ঠিক আছে, বৈশাখি। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি–আমি খুব দ্রুত হাঁটব, হয়তো বিশ্রামের জন্যেও থামব না, তুমি যদি পিছিয়ে পড়ো, তোমাকে ফেলেই এগিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'আমাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে, কাজেই সারাক্ষণ কানের কাছে চিঁচিঁ করতে পারবে না।'

'পরদেশী!' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল মেয়েটা। 'সবাই বলে বৈশাখির গলা খুব মিষ্টি, আর আপনি কিনা...'

'কোন প্রশ্ন করতে পারবে না, আর যা বলব তাই শুনতে হবে। এ-সব শর্ত অমান্য করলে তোমাকে আমি রিমাউদের কাছে ফেলে রেখে যাব।'

আবার রানার মুখে হাতচাপা দিল বৈশাখি। 'একবার না বলেছি, নামটা বারবার উচ্চারণ করবেন না!' মাথা ঝাঁকাল দ্রুত। 'ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'তুমি সোলায়মানের ক্যাম্পে গিয়েছিলে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোন দিকে সেটা?'

জঙ্গলের উত্তর দিকটা হাত তুলে দেখাল বৈশাখি। 'ওদিকে। একদিনের পথ।'

'প্রথম ওদিকেই যাব আমরা,' বলল রানা। 'তুমি পথ দেখাবে।' জঙ্গলে একদিনের পথ কাছেও হতে পারে, আবার দূরেও, নির্ভর করে জঙ্গলটা কতটুকু দুর্ভেদ্য তার ওপর। তবে সোলায়মানের পরিত্যক্ত ক্যাম্প রানার জন্যে স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে। ওখান থেকেই শুরু হবে ওর অভিযান। সোলায়মানের সঙ্গে প্রচুর লোক আছে, পায়ের ছাপ অনুসরণ করা কোন সমস্যাই নয়। তবু সতর্ক থাকতে হবে ওকে। সোলায়মান নিশ্চয়ই পিছনে স্কাউট রেখে যাবে। 'চলো তাহলে, দেরি করে লাভ নেই।'

রানার র‍্যাকস্যাকটা তুলল বৈশাখি। 'এটা আমি বইতে পারব, পরদেশী। তেমন ভারী নয়। বৈশাখি আপনার উপকারে লাগবে।'

শ্রাগ করে তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা।

খানিক পরই বুঝতে পারল ও, জঙ্গলের ভেতর পথ চলায় ওর চেয়ে অনেক বেশি পটু মেয়েটা। উত্তর দিকে রওনা হলো ওরা, একটু পরই গভীর জঙ্গলে ঢুকল। সামনে রয়েছে রানা, ম্যাশেটি দিয়ে পথ তৈরি করে এগোচ্ছে। কপালের ঘাম চোখে নেমে আসছে। জোঁকগুলো উঠে আসছে পা বেয়ে।

ওর পিছনে বাঘকে খুশি করার জন্যে বিশেষ গান গাইছে বৈশাখি। গানের বক্তব্যটা হলো, সব বাঘই আসলে বৃদ্ধ এবং অতিমাত্রায় ভদ্রলোক, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সম্মানসূচক পদবী আছে–মহাশয়, মান্যবর, মহান রক্ষক ইত্যাদি;

তাছাড়া, আত্মসম্মান আছে এমন কোন বাঘ কখনোই অসহায় একটা মালয়ী তরুণীর পিছু নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করে না।

গানের মধ্যে রানার কোন উল্লেখ নেই। হাসি চেপে প্যাসেজ তৈরিতে ব্যস্ত থাকল ও। মাঝে মধ্যে থেমে সিগারেট ধরিয়ে গা থেকে জোঁক খসাতে হলো। বৈশাখি বারবার বলল, রানা অনুমতি দিলে আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ ধরে সোলায়মানের ক্যাম্পে পৌঁছুতে পারে ওরা। কিন্তু রানা তার কথায় কান দিল না।

বৈশাখির ধারণাই ঠিক। সোলায়মানের ক্যাম্পে পৌঁছুতে সারাদিন লেগে গেল ওদের। রওনা হবার দু'ঘণ্টা পর অস্পষ্ট একটা ট্রেইল খুঁজে পাওয়ায় হাঁটার গতি বেড়ে যায় ওদের, তবে সেই সঙ্গে বিপদের ভয়ও বাড়ে। পাতায় ঢেকে রাখা গহ্বর, পিছনে রেখে যাওয়া সেন্ট্রি, অ্যামবুশ ইত্যাদি ছাড়াও কত রকমের ফাঁদ থাকতে পারে। গেরিলারা এ-সব কৌশল সব সময় কাজে লাগায়।

তবে এক্ষেত্রে লাগায়নি। জোঁক ছাড়া আর কোন সমস্যা হলো না। নিকষ কালো ছায়ার মত একবার একটা প্যান্থারকে দেখল রানা, চোখাচোখি হতেই স্যাঁৎ করে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকবার মাকড়সার জাল বাধা হয়ে দাঁড়াল, প্লাস্টিকের মত শক্ত, ম্যাশেটি দিয়ে কেটে পথ করে নিতে হলো।

কাপালা পাহাড় থেকে নেমে আসার পর বনভূমি আরও গভীর হয়ে উঠল, তবে ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে বলে হাঁটার গতি কমাতে হলো না। সমতল ভূমি ধরে মাইল তিনেক এগোবার পর আবার ঢাল শুরু হলো। ওরা কোন পাহাড়ে উঠছে না, এদিকের জমিন এমনিতেই ক্রমশ উঁচু হয়ে উপকূলের দিকে এগিয়েছে। বৈশাখির চেনা পথ থেকে সরে আছে রানা, ম্যাপে চোখ রেখে এড়িয়ে থাকছে কাছাকাছি গ্রামগুলোকে। একটা করে গ্রামের নাম বলে ও, শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মেয়েটা, তারপর হাত তুলে দেখিয়ে দেয় কোন দিকে যেতে হবে। ফলে মাঝে মধ্যেই ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকতে হলো ওদেরকে।

ইতিমধ্যে দিগন্তরেখার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সূর্য। জঙ্গল হালকা হয়ে আসছে, বুঝতে পেরে খানিকটা উদ্বিগ্ন হলো রানা। বৈশাখির নির্দেশে আবার দিক পরিবর্তন করতে হলো। সামনে পড়ল ছোট একটা পাহাড়। সেটাকে পেঁচানো পথ ধরে ওপরে উঠছে ওরা। প্রচুর গাছপালা আছে পথের একপাশে, আরেক পাশে খাদ। তবে মাঝে মধ্যে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা গ্র্যানিট পাথরও চোখে পড়ল। এরকম পাথর পথের ওপরও পাওয়া গেল। এত পুরানো আর ঝুরঝুরে যে কোদালের ঘা দিয়ে ভেঙে সরানো যায়। একবার রানার পা এমনভাবে ডেবে গেল, পাথর যেন ভাজা পাঁপড়, পা পিছলে একটুর জন্যে খাদে পড়ল না। সেই থেকে সাবধানে পা ফেলছে ওরা।

সূর্য ডোবার ঠিক আগে সেদিন তৃতীয়বারের মত বৃষ্টি শুরু হলো। পথে প্রায় কোন কথাই বলেনি বৈশাখি, বৃষ্টি শুরু হতেই নরম সুরে ডাকল সে। 'পরদেশী। ঠিক সামনে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সামনেটা দেখে নিচ্ছে।

'সামনে একটা পাহাড়ের পাঁচিল আছে। খাদের গা। নিচে নামার জন্যে ধাপ

আছে। সোলায়মানের ক্যাম্প ওখানেই।'

রানা দেখল, পাহাড়-প্রাচীর আর ওদের মাঝখানে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান। দূরত্বটা পেরুতে হলে ফাঁকা জায়গায় বেরুতে হবে। ঝোপ গাছ, পাথর কিছুই নেই। কান পাতল রানা। সময়টা স্থির, গোধূলির আলোয় কোথাও কিছু নড়ছে না, নিস্তব্ধতাও অটুট। তবু রানার মনে হলো, কোথাও থেকে একটা শব্দ আসছে। একটু পরই চিনতে পারল আওয়াজটা। কাছাকাছি না হলেও, খুব বেশি দূরে নয়, স্রোতস্বিনী একটা ঝরনা আছে, এ তারই অস্পষ্ট কলকল ধ্বনি।

বৈশাখিকে ইঙ্গিত করল রানা, সে যেন দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর ক্রল করে খাদের কিনারার দিকে এগোল একা।

চোখে বিনকিউলার তুলে খাদের নিচটা দেখল ও। স্বস্তিবোধ করল নিচে কিছুই নড়ছে না। জায়গাটা খালিই। পাহাড়ের কার্নিশ থেকে ফাঁকা প্রতিটি ইঞ্চির ওপর চোখ বুলাল ও। কুকুর, বিড়াল, শূকর, মানুষ কিছুই নেই। গাছগুলোয় একটা পাখি পর্যন্ত নেই। সারি সারি অনেকগুলো পাথরের গুহা দেখা গেল, ভেতরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কিছুই নড়ছে না। চেঁচাড়ি দিয়ে তৈরি কুঁড়েও আছে, সব খালি মনে হলো। বৃত্তাকারে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজা কয়লা দেখে বোঝা গেল। পরিত্যক্ত ক্যাম্পের একপাশ দিয়ে সরু একটা নালা পথ করে নিয়েছে, পানির স্রোত খুবই তীব্র, বোল্ডারে বাধা পেয়ে লাফ দিয়ে ছুটছে।

ক্যাম্পের একপাশে চারটে বাঁশ পুঁতে প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা হয়েছে, ল্যাট্রিন। ওটার কাছাকাছি আবর্জনার একটা স্তূপ। রানা যত দূর দেখতে পাচ্ছে, ওই একটাই ল্যাট্রিন। এর মানে হলো, সোলায়মান বাহিনীতে কোন মেয়ে নেই। ব্যাপারটা মেলে। পাশার মুখেই শুনেছে রানা, নারী-বিদ্বেষী বলে কুখ্যাতি আছে সোলায়মানের।

মিনিট পনেরো ক্যাম্পটা পরীক্ষা করল রানা, তারপর ইঙ্গিতে কাছে ডাকল বৈশাখিকে। ছোট হলেও, একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও। রাতটা ক্যাম্পে কাটাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, পিচ্ছিল পাথরের ওপর সাবধানে পা ফেলে ওর কাছে আসছে বৈশাখি। সারাদিন প্রায় কোন কথা বলেনি। রানা জানে, রাকস্যাকটা তেমন ভারী না হলেও একটা মেয়ের জন্যে আট ঘণ্টা বয়ে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। সেটা তার পিঠ থেকে নামিয়ে নিল, ইঙ্গিতে নিচের ক্যাম্পটা দেখিয়ে বলল, 'রাতটা ওখানেই থাকব আমরা। নিচে নামার পথটা কোন দিকে?'

খাড়া পাহাড়ের গা দেখিয়ে বৈশাখি বলল, 'ধাপ আছে।'

'কোথায়?' রানা কোন ধাপ দেখছে না।

রানার হাত ধরে খাদের আরও কিনারায় সরে এল বৈশাখি, হাত দিয়ে গ্র্যানিট পাথরে গাঁথা প্রথম লোহার পেরেক বা গজালটা দেখাল ওকে। ওগুলোকেই ধাপ বলছে সে।

রানার চেহারা দেখে হেসে উঠল বৈশাখি। 'ভয়ের কিছু নেই, মশাই। ওই ধাপ বেয়ে ওঠা-নামা করেছি আমি। ভেতরে অনেকটা গাঁথা, বেরিয়ে আসবে না।'

সত্যি তাই। তবে সবগুলো নয়। রানার শরীরের ভারে দু'একটা কাত হতে শুরু করল। বৈশাখি ওর পিছু নিয়ে অনায়াস সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে আসছে, যেন শিতে ঝুলন্ত একটা বানর।

রান্নার জন্যে বৈশাখিকে আগুন ধরাবার নির্দেশ দিয়ে ক্যাম্পটা দেখতে বেরুবে রানা। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ও, ক্যাম্পটা সত্যি খালি। বিপদের কোন ভয় নেই। তবু সাবধানের মার নেই।

'আগুনটা কোথায় জ্বালানো উচিত, পরদেশী?'

একটা গুহার দিকে হাত তুলল রানা। 'ভেতর দিকে, কেমন? বড় নয়, ছোট আগুন, ঠিক আছে?'

'বৈশাখি জানে।'

ক্যাম্পে ওরা কিছুই ফেলে যায়নি। এমন কি খরচ করা একটা কার্টিজ কেসও নয়। টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে অতিরিক্ত অ্যামিউনিশন গেরিলাদের কাছে থাকে না। ক্যাম্পটা দ্রুত ঘুরে দেখার সময় রানা লক্ষ করল, ল্যাট্রিনে চুন ফেলা হয়েছে গন্ধ দূর করার জন্যে। দাতো সোলায়মান সম্পর্কে ওর ধারণা আরও একটু পরিষ্কার হলো। খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের মাস মার্ডারার সে। চুন অপ্রয়োজনীয় একটা বোঝা, খরচও কম নয়।

গুহায় ফেরার আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। সন্ধেটা ঠাণ্ডা, বাতাসে জঙ্গলের বিচিত্র সব সুবাস। বাতাসটা পুব দিক থেকে আসছে, আর সব গন্ধের সঙ্গে জলাভূমি ও লোনা পানির গন্ধও পেল রানা। উপকূলে পৌঁছুবার আগে কর্দমাক্ত জলা পেরুতে হবে ওদেরকে।

আগুনটা গুহার আরও একটু ভেতরে হলে খুশি হত রানা, তবে কোন অভিযোগ করল না। ভেতরে বা বাইরে, বৈশাখিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে তাকিয়ে বোকা হয়ে গেল। বৈশাখি নেই।

'বৈশাখি?'

সাড়া নেই। খবারের গন্ধ পেয়ে গুহার ভেতর ঢুকল রানা। পাথর সাজিয়ে চুলো বানিয়েছে বৈশাখি, শুকনো মাংসের কয়েকটা কৌটা খুলে মেসকিট-এ ঢেলেছে, আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে মাংস। গরম খাবার কতদিন খায়নি, জিভে জল এসে গেল। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? আগুনের আভার কাছ থেকে সরে এল রানা, নিজেকে সহজ টার্গেট হতে দিতে রাজি নয়। ব্রাউনিংটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল, আড়াল নিল মাঝারি আকৃতির কয়েকটা বোল্ডারের পিছনে। বৈশাখি যদি কাউকে ডেকে আনতে গিয়ে থাকে...

অন্ধকার ক্যাম্পে ফিরে আসছে বৈশাখি, সুর করে একটা গান গাইছে। কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না, তবে রানার মনে হলো প্রেমের গানই হবে। গুহার ভেতর ঢুকল সে। আগুনের আভায় রেশমের মত চকচক করছে লম্বা চুল, ভেজা শরীর পিচ্ছিল আর নরম লাগছে দেখতে। চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় খোপা তৈরি করল, ক্লিপ হিসেবে সম্ভবত ঝোপের লম্বা কাঁটা ব্যবহার করল। একজোড়া বুনো ফুলও তুলে এনেছে, সুতোর মত সরু পাতার শিরা দিয়ে দুল বানিয়ে পরল কানে। শুধু গোসল করেনি, সারঙটাও ধুয়ে এনেছে। রানার শার্টটা ভেজায়নি,

গুহায় ঢুকেই ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে রাকস্যাকের ওপর। রানার সাবানটা রেখেছে চুলোর এক ধারে।

রানাকে গুহায় ঢুকতে দেখে একটু লজ্জা পেল মেয়েটা। 'পরদেশী, আপনার সাবান ব্যবহার করেছি বলে কি আপনি রাগ করলেন? আসলে, রাতে ঝরনার পানিতে গোসল করতে ভালবাসে বৈশাখি।'

'না, রাগ করিনি,' বলল রানা। ঝুঁকে সাবানটা হাতে নিল। 'তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করো। গোসলটা আমিও সেরে আসি।'

ঝরনার পানিতে নামল বটে রানা, তবে কাপড়চোপড় আর ব্রাউনিংটার কাছ থেকে বেশি দূরে গেল না। বৈশাখিকে নিয়ে চিন্তা করছে ও। বৈশাখির গোসল করাটা কি কোন ইঙ্গিত? তা যদি হয় তাহলে ওর গোসল করতে আসাটাকেও সে পাল্টা ইঙ্গিত বলে ধরে নেবে। ইঙ্গিত, পাল্টা ইঙ্গিত–ব্যস, এই পর্যন্তই। রানা কোন রকম জোর খাটাবে না, এমন কি নিজে থেকে আর কোন ইঙ্গিতও দেবে না। তবে বৈশাখি যদি আরও সঙ্কেত দেয়, কি ঘটবে ওর কোন ধারণা নেই। নিয়তি বলে একটা কথা আছে। প্রকৃতি হয়তো তার নিজস্ব স্বভাব বজায় রাখবে।

গুহায় ফিরে রানা দেখল খাবার প্রস্তুত। খাওয়া শেষ হতে রাকস্যাক থেকে চকলেট বের করল ও। বৈশাখি সিগারেট চাওয়ায় মাথা নাড়ল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে, 'তুমি সিগারেট খাও না। বৈশাখি খায়। তুমি চাও না বৈশাখি সিগারেট খাক?'

'না, চাই না।'

'তাহলে আগে বলোনি কেন?'

'বললে তুমি শুনতে?'

'কি জানি। হয়তো।'

মুখ হাত তুলে হাই তুলল রানা। খানিক পর দাঁড়াল ও, গুহার ভেতর দিকে সরে এল। বৈশাখিও দাঁড়াল, ওর পিছু নিয়ে আসছে। 'পরদেশী?'

'কি ব্যাপার, বৈশাখি?'

গুহার বালিতে ফেলা স্লীপিং ব্যাগটার দিকে তাকাল বৈশাখি। 'একা শুতে ভয় করে আমার। আপনার ওই ব্যাগের ভেতর আমি শুতে পারি?'

'ঠিক আছে, শোও। আমাকে তাহলে বালির ওপর শুতে হবে।'

চোখ নামিয়ে আবার তুলল বৈশাখি। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। 'বললাম না, একা শুতে আমার ভয় করে।'

'ভয় করে? ব্রিমাউকে?'

নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখল বৈশাখি। 'পিলিজ, পিলিজ!' ফিসফিস করল। 'শুনে ফেলবে!'

'বৈশাখি, তুমি স্লীপিং ব্যাগেই শোও,' বলল রানা। আমি ওটার পাশেই শোব। সারারাত জেগে মশা তাড়াতে হবে, এই যা।'

'কেন, ব্যাগটায় তো দু'জনেরই জায়গা হবার কথা।'

'যদি হয়ও, তোমার শুতে কোন আপত্তি নেই?'

চোখ নামাল বৈশাখি, এবার আর তুলল না। 'আজ সারাটা দিন শুধু আপনার কথা ভেবেছি, পরদেশী। কি জানি কেন। শুধু মনে হয়েছে, আপনি আমাকে টানছেন।' খেতে বসার আগে রানার শার্টটা আবার গায়ে দিয়েছিল সে, চোখ না তুলেই সেটার বোতাম খুলতে শুরু করল। 'আপনি আমাকে সুন্দরী বলেছেন, বলেননি?' এতক্ষণে চোখ তুলল সে।

'হ্যাঁ, বৈশাখি, বলেছি। সত্যি তুমি অসম্ভব সুন্দর।'

'তাহলে বলুন বৈশাখি কোন অন্যায় করছে না।'

হেসে ফেলল রানা। 'বোধ হয় না,' বলল ও। 'বোধহয় কেন, সত্যি তুমি কোন অন্যায় করছ না। তুমিও না, আমিও না।'

সোলায়মানের ট্রেইল অনুসরণ করার সমস্যা হলো, একটা পর্যায়ে আগাছায় ঢাকা জলাভূমি ধরে এগিয়েছে সেটা। রানাকে যেতে হবে পুব দিকে, উপকূলে, কিন্তু সামনে জলাভূমি দেখতে পেয়ে উত্তর দিকের ট্রেইল ধরল ও। জলাটা একদম ফাঁকা, ওখানে কিছু নড়াচড়া করলে বহু দূর থেকে দেখা যাবে। তাছাড়া, বৈশাখি সাবধান করে দিল, জলায় রাক্ষুসে অনেক কুমীর আর বিষাক্ত সাপ আছে। কুমীরগুলো নাকি বাগে পেলে হাতিকেও ছাড়ে না।

জঙ্গলের ভেতর এলিফেন্ট ট্রেইল অনুসরণ করছে রানা। এক কি দেড় ঘণ্টা পর পর ট্রেইল ছেড়ে দেখে আসছে জলাভূমির শেষ সীমানায় পৌঁছুতে আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে। ঘোরা পথে এগোতে হচ্ছে, তাতে সময় ও শ্রম বেশি লেগে যাচ্ছে, মেজাজটা তাই খিঁচড়ে আছে রানার। সেটা সপ্তমে চড়ল এলিফেন্ট ট্রেইল পশ্চিম দিকে ঘুরে যাওয়ায়। দক্ষিণ চীন সাগর পুব দিকে, পশ্চিমে কোন সাগর নেই, কাজেই ওদিকে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ট্রেইল ত্যাগ করে এগোতে হলে জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করতে হবে। অনেকটা জেদের বশেই রানা সিদ্ধান্ত নিল অন্তত কিছুটা দূর ট্রেইল ধরে পশ্চিম দিকেই যাবে ওরা, দেখবে সেটা আবার উত্তর বা পুব দিকে ঘুরেছে কিনা। তা যদি ঘোরে, জলাভূমির দিকে ফিরে আসাটা সহজ হবে।

আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে হলো, বলা যায় সেটাই এক সময় স্বর্ণ প্রসব করল। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর অকস্মাৎ আরেকটা ট্রেইল দেখতে পেল রানা, জলাভূমির দিক থেকে এসে প্রথমটার সঙ্গে মিশেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল রানা, মাথার ভেতর ঢং-ঢং করে বিপদসঙ্কেত বাজছে। দ্বিতীয় ট্রেইলের দু'পাশের ঝোপ-ঝাড় নুয়ে আছে, সরু ডালপালা সব ভাঙা। প্রথমে মনে হলো জলাভূমি থেকে পানি খেয়ে এদিক দিয়ে একটা হাতির পাল চলে গেছে। কিন্তু হাতি শুধু ঝোপ-ঝাড় পদদলিত করবে কেন? হাতির স্বভাবই গাছপালা ভাঙা, অথচ একটা গাছও ভাঙেনি। তাছাড়া, হাতি কি সিগারেট খায়? দুই ট্রেইল যেখানে মিলিত হয়েছে, ওখানে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়ে রয়েছে কেন?

উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। বৈশাখির হাত ধরে প্রথম ট্রেইলের পাশে ঝোপের ভেতর চলে এল। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকতে বলল মেয়েটাকে। চিন্তা করছে ও।

পুব অর্থাৎ উপকূলের দিকে রওনা হয়ে সোলায়মান বাহিনী পশ্চিম দিকে ফিরল কেন? সাবমেরিনটা খুঁজে পায়নি, তাই নিজেদের ঘাঁটি অর্থাৎ থাই সীমান্তের দিকে ফিরে যাচ্ছে? সাবমেরিন খুঁজে পায়নি, এটা মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। অন্তত যুক্তিতে মেলে না। কত বছর আগে ডুবেছে সেটা, খুঁজে বের করতে হলে আরও অনেক বেশি সময় দিতে হবে, সোলায়মানের মত অভিজ্ঞ গেরিলা লীডারের তা জানার কথা। তাছাড়া, ওদের ফেরার ধরনটাই বা এমন বিশৃঙ্খল কেন?

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে শুরু করল। প্রথমে বিশৃঙ্খলার কারণটা আন্দাজ করল রানা। জলার দিক থেকে ট্রেইল ধরে যারা পশ্চিম দিকে গেছে তাদের সঙ্গে যোগ্য কোন লীডার নেই। সরকারী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন একটা গেরিলা বাহিনীর কোন সদস্য যদি ট্রেইলের ওপর সিগারেট ফেলে যায় সেটাকে অক্ষমনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত, শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড। আর শুধু যে সিগারেট ফেলে গেছে তা তো নয়, দলটা একলাইনেও এগোয়নি। তা এগোলে ট্রেইলের পাশের ঝোপ-ঝাড় ভাঙত না।

গেরিলারা দু'ভাগ হয়ে গেছে। জলাভূমির কিনারা থেকে কিছু লোককে নিয়ে পুব অর্থাৎ উপকূলের দিকে রওনা হয়েছে সোলায়মান। অপর দলটা ফিরে যাচ্ছে নিজেদের ঘাঁটিতে। সঙ্গে সোলায়মান নেই, নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে অযোগ্য কোন লোক, গেরিলারা তাকে তেমন ভয় পায় না বা শ্রদ্ধা করে না।

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা। ভাবছে এখন ওর কি করা উচিত। এটা ওর কোন অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নয়, কারও অনুরোধ বা নির্দেশ মেনে চলতে হচ্ছে না। প্রিয় বন্ধু আবু রাশেদকে খুন করেছে সোলায়মান বাহিনীর গেরিলারা, ওর প্রতিজ্ঞা প্রতিশোধ নিতে হবে। তবু ব্যাপারটা শুধুই প্রতিশোধগ্রহণ নয়। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র, এই সুযোগে তাদের খানিকটা উপকার করার সুযোগ পেলে রানা সেটা হাতছাড়া করবে না। এটা তো পরিষ্কারই যে শুধু সোলায়মানকে খুন করলে না হয় পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া, না হয় মালয়েশিয়ার তেমন কোন উপকার। এমই-র অন্যতম এজেন্ট পাশা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা দিয়েছে ওকে। সোলায়মান বাহিনী বিরাট এলাকা জুড়ে শুধু যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, তা নয়, সিআইএ-র সাহায্য পেয়ে তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে কোটা বারু সহ এক দেড়শো কিলোমিটার, তেরেনগানু ও কেলানতান রাজ্যের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নেয়ার কথা ভাবছে।

কাজেই সমস্যার সমাধান সোলায়মান বাহিনী নিশ্চিহ্ন করা।

হঠাৎ নিঃশব্দে হেসে ফেলল রানা। নিজেকে মনে হলো–ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। গেরিলাদের সঙ্গে আধুনিক একটা সেনাবাহিনীই যখন পেরে উঠছে না, সেখানে একা ও কি করতে পারবে!

'বৈশাখি জানে পরদেশী কেন হাসছেন,' পাশ থেকে ফিসফিস করল মেয়েটা।

'ঘোড়ার ডিম জানে,' বলে ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। 'চুপ!'

কিন্তু বৈশাখি চুপ করল না। 'বৈশাখি চায় দাতোর সবগুলো দাঁত পরদেশী

ভেঙে দিক।'

'মানে? সবগুলো দাঁত মানে?'

'দাতোকে সরকারী সৈন্যরা কালো কুমীর বলে, আর কুমীরের দাঁতগুলো হলো একেকটা নেয়ামত। দাতো সাবমেরিনের খোঁজে গেছে, ঠিক? কিন্তু নেয়ামতরা গেছে এদিক দিয়ে অন্য কোথাও। আমরা যদি তাদের পিছু নিই, পথে হয়তো কোথাও দেখা হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে পেট্রলের ড্রাম আছে, বৈশাখি দেখেছে।'

মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। কি আশ্চর্য, এতক্ষণ টেরই পায়নি বুদ্ধির একটা ভাণ্ডার রয়েছে সঙ্গে। 'কি বলতে চাও, বৈশাখি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'বৈশাখির আর কতটুকু বুদ্ধি। আপনার যা ভাল মনে হয় তাই করুন। তবে সত্যি বলছি, ওদের কাছে পেট্রল ভর্তি ড্রাম দেখেছি।'

'তো কি হলো? পেট্রল আমাদের কি কাজে আসবে?' এরইমধ্যে রানার মাথায় একটা আইডিয়া গজাতে শুরু করেছে।

'কুমীরের দাঁতগুলো হয়তো নেরোস নদী পেরিয়ে বেসুত গ্রামের দিকে যাচ্ছে,' বলল বৈশাখি। 'বেসুতের ওদিকে সরকারী সৈন্যদের একটা চৌকি থাকার কথা। সেটা হয়তো ওরা জ্বালিয়ে দেবে।'

'আমাদের এখন তাহলে কি করা উচিত?'

'আমি কি করে বলব। তবে কুমীরটাকে মারতে পারলে আমি খুশি হই। আরও খুশি হই তার আগে কুমীরের দাঁতগুলোকে যদি উপড়ে ফেলা যায়।'

'অর্থাৎ নেয়ামতদের একটা ব্যবস্থা করে তারপর সোলায়মানকে ধরতে যাই আমি, এই তুমি চাও?'

বৈশাখি কথা না বলে অন্য দিকে তাকাল।

'কিভাবে, বৈশাখি? নেয়ামতদের বিরুদ্ধে একা আমি কি করতে পারব?'

'একা আপনি কুমীরটার বিরুদ্ধেই বা কি করতে পারবেন?' সরল হলেও, যৌক্তিক প্রশ্ন তুলল বৈশাখি। 'অথচ রওনা হয়েছেন তো কিছু একটা করার জন্যেই।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি অস্ত্র চালাতে জানো?' ইঙ্গিতে হোলস্টারে ভরা ওয়ালথারটা দেখাল।

মাথা নাড়ল বৈশাখি। তারপর রানার হাতের ম্যাশেটিটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা দিন।'

ওরা অত্যন্ত সাবধানে রওনা হলো। এলিফ্যান্ট ট্রেইল ধরে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর ট্রেইলটা উত্তর দিকে ঘুরে গেল। নেরোস নদীটাকে দু'বার পেরুতে হলো ওদেরকে। গেরিলারা যে বেসুত গ্রামের দিকে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, নদীর কিনারায় তাদের পায়ের ছাপ স্পষ্ট। বাঁশ কেটে ভেলা বানিয়েছে তারা, ওদেরকেও তাই বানাতে হলো। দ্বিতীয়বার নদী পেরুবার পর সন্ধে হয়ে এল। বৈশাখি বলল, কোথাও থামা দরকার, কারণ এদিককের জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বেশি। কিন্তু ম্যাপ দেখে রানা সিদ্ধান্ত নিল, আকাশে চাঁদ থাকায়

অন্তত আরও দু'তিন ঘণ্টা হাঁটবে। বেসুত থেকে মাত্র তিন-চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে ওরা।

নদীর এপারে কোন ট্রেইল নেই, জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করে এগিয়েছে গেরিলারা। তারপর আবার একটা এলিফ্যান্ট ট্রেইল পাওয়া গেল। কি হয়েছে কে জানে, বৈশাখি অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ছে। মাঝে মধ্যে তাকে দেখাই যাচ্ছে না। কয়েকবার থামতে হলো রানাকে, চাপা গলায় ধমক দিল, 'তুমি কি বিপদে পড়তে চাও? আমাকে হারিয়ে ফেললে খুঁজে পাবে কিভাবে? বুঝতে পারছ না, গেরিলারা কাছাকাছি কোথাও আছে?'

'বৈশাখিকে নিয়ে চিন্তা করবেন না,' বলল মেয়েটা। 'এদিকের জঙ্গল আমার খুব চেনা।'

'কিন্তু তুমি চোখের আড়ালে থাকলে কোন বিপদ হলো কিনা জানতেও পারব না...'

'সামনে আপনি আছেন, বিপদ হলে আপনার হবে,' যুক্তি দেখাল বৈশাখি।

মেয়েটাকে স্বার্থপর মনে হলো। যে সামনে আছে বিপদ হলে তারই হবে, কাজেই সে নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না, কাজেই আবার যখন পিছিয়ে পড়ল বৈশাখি, তার জন্যে রানা অপেক্ষা করল না। ট্রেইল ধরে যাওয়া বিপজ্জনক, কারণ গেরিলারাও এই ট্রেইল ধরে এগিয়েছে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাবার জন্যে থেমেছে তারা। ক্যাম্প ফেলে থাকলে ট্রেইলের ওপর নিশ্চয়ই তারা পাহারা বসিয়েছে। ব্রাউনিংটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল রানা, ছুরিটা রাখল ডান হাতে। বিপদ দেখলে ছুরিটাই আগে ব্যবহার করতে চায়, গুলি করলে মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হবে।

আকাশে চাঁদ থাকলেও জঙ্গলের ছাদ ভেদ করে তার আলো নিচে খুব কমই পৌঁছাচ্ছে। জঙ্গল ঘুটঘুটে অন্ধকার, তবে ট্রেইলটা অস্পষ্টভাবে কিছু দূর দেখা যায়।

ওদের সামনে বা পিছন থেকে নয়, বিপদটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জনের মাঝখান থেকে। গেরিলারা দু'জন স্কাউট রেখে গেছে ট্রেইলের পাশে। রানাকে তারা পাশ কাটিয়ে যেতে দিল, তারপর পাশের ঝোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ট্রেইলের ওপর।

রানাকে একা দেখে সন্দেহ হলো তাদের। ভাবছে নিজেদের কোন দলছুট লোক কিনা। একজন গেরিলা চিৎকার করে থামতে বলল, 'হল্ট!'

এরপর যা ঘটল, নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। চিন্তা করার কোন সময়ই নিজেকে দেয়নি রানা। পিছনে ক'জন ওরা, জানে না। শব্দটা কত দূর থেকে এল সেটাও আন্দাজ করেছে ওর ইন্সটিঙ্কট প্রায় কোন সময় না নিয়েই। আধ পাক ঘোরা শেষ হয়নি তখনও, হাত থেকে বেরিয়ে গেছে স্টিলেটো। শব্দের উৎস ছিল একজন গেরিলার গলা, ঠিক সেখানেই ঘ্যাঁচ করে বিঁধে গেল ফলা, প্রায় হাতল পর্যন্ত।

কিন্তু দ্বিতীয় গেরিলা ছিল পিছনে, আধ পাক ঘোরা শেষ করার পরও তাকে দেখতে পায়নি রানা। প্রথম লোকটা অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু'হাত দিয়ে গলায় গাঁথা

ছুরির হাতল ধরে টলছে। তার পিছনে এ-কে/কারটিসেভেন বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছে দ্বিতীয়জন। সঙ্গীকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে, সে পড়ে গেলেই ট্রিগার টেনে দেবে।

রানা ফিসফিস করল, 'বৈশাখি?'

কোন সাড়া নেই।

হোঁচট খেতে খেতে কয়েক পা সামনে বাড়ল প্রথম গেরিলা। আড়াল নিয়ে তার পিছন পিছন এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় লোকটা। তারপর কাতর একটা গোঙানির আওয়াজ হলো। প্রথম গেরিলা আছাড় খেলো, তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল দ্বিতীয় লোকটা। দু'জনেই ট্রেইলের ওপর মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে জোড়া শরীর। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখে স্বভাবতই চমকে উঠেছে রানা। ইতিমধ্যে ট্রেইল ছেড়ে ঝোপের আড়ালে সরে এসেছে ও। উঁকি দিয়ে দেখছে আর কেউ আছে কিনা, বৈশাখিই বা কোথায়!

ট্রেইলের ওপর চাঁদের আলো ক্ষীণ হলেও, দ্বিতীয় লোকটার পিঠে কিছু একটা চকচক করতে দেখল রানা। কোন শব্দ হয়নি, ট্রেইল এড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হঠাৎ রানার একেবারে পাশে উদয় হলো মেয়েটা। ফিসফিস করে বলল, 'প্রমাণ পেলেন? বৈশাখি স্বার্থপর কিনা?'

মেয়েটার কি সাইকিক পাওয়ার আছে, মানুষের মনের কথা পড়তে পারে? রানা কিছু বলছে না।

'আপনি যদি বলেন তো যাই, শালার পিঠ থেকে খুলে আনি ম্যাশেটিটা,' আবার ফিসফিস করল বৈশাখি।

'যাও, আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি,' বলল রানা। 'আমার ছুরি আর ওদের একটা রাইফেল নিয়ে এসো।'

অস্ত্রগুলো নিয়ে ফিরে এল বৈশাখি। রানার গালে গাল ঘষল সে। 'সত্যি কিনা বলুন, বৈশাখি আপনার বোঝা নয়, বরং উপকারী বন্ধু?'

আদর করে তাকে কাছে টেনে নিল রানা। কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করল, 'ধন্যবাদ, বৈশাখি। আমি কৃতজ্ঞ। ম্যাশেটি নিয়ে তৈরি থাকো।' সাবধানে লাশ দুটোর কাছে চলে এল ও, পা ধরে ঝোপের ভেতর টেনে আনল। সার্চ করে দু'জোড়া গ্রেনেড পাওয়া গেল, বেল্টে ঝোলানো পাউচে ভরা।

'এখন বুঝলেন তো, কেন আমি পিছিয়ে ছিলাম?' রানা ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করল বৈশাখি।

'থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।'

'পথে যখন পাহারা বসিয়েছে, গেরিলাদের ঘাঁটিটা কাছাকাছি কোথাওই হবে,' বলল মেয়েটা। 'জঙ্গল কাটলে আওয়াজ হবে, আবার পথের ওপর থাকাও বোকামি। বৈশাখি ঠিক বলছে?'

'বৈশাখি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে পারে,' বলল রানা। 'কোন শব্দ হয় না। রানা তার পিছু নেবে। ঠিক আছে?'

'মশাইয়ের নাম তাহলে রানা? বৈশাখির ভাগ্যই বলতে হবে, দেরিতে হলেও নামটা জানা হলো। কোন্ দেশ থেকে এল রানা? কালো কুমীরের সঙ্গে কিসের

তার শত্রুতা?'

'সময় হলে বলব। সামনে বিপদ, আগে চলো...'

'রানা খুব সাবধানী মানুষ। মন খুলে কথা বলতে ভয় পায়।'

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখল রানা। 'রাত মাত্র সাড়ে আটটা। আমরা সময় নষ্ট করছি, বৈশাখি।'

বৈশাখির পিছু নিয়ে রওনা হলো রানা। ব্রাউনিঙের বদলে হাতে এখন এ-কে/ফরটিসেভেন। মেয়েটার এগোবার পদ্ধতি অদ্ভুত। ব্যাপারটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না ও। জীবনে এই প্রথম দেখল, মানুষ বসা অবস্থায় কি অনায়াসে ও দ্রুতগতিতে এগোতে পারে। ট্রেইলের যতটা সম্ভব পাশেই থাকছে বৈশাখি, ঝোপ ঘন হলে সেগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে, উঁচু হলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে, হালকা হলে দু'হাত দিয়ে ফাঁক করে ভেতরে সেঁধোচ্ছে। মাঝে মধ্যে দাঁড়াল, দেখে নিল সামনে কি আছে, কিন্তু এগোবার সময় বসে পড়ল, পায়ের সামনে পা ফেলছে, হাত দুটোও বেশিরভাগ সময় মাটিতে থাকছে। প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। কখনও কখনও আরও এক বিচিত্র পদ্ধতি ব্যবহার করছে বৈশাখি। দু'হাত শরীরের দু'পাশে ঘাসের ওপর রেখে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলছে নিতম্ব, দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে সামনে এগোচ্ছে। বিশেষ করে শুকনো পাতা এড়াবার জন্যে এটা খুবই নিরাপদ পদ্ধতি, গতি আরও বেশি। পাহাড়ী মেয়ে, গাছে চড়ার অভ্যাস আছে, হাত-পায়ে অসম্ভব শক্তি। রানা তাকে অনুকরণ করতে গিয়ে দু'তিনবার মুখ থুবড়ে পড়লেও, কিছুক্ষণের মধ্যে কৌশলটা আয়ত্ত করে ফেলল।

রাত ন'টার দিকে ছোট একটা পাহাড় পড়ল সামনে, এক হাজার থেকে বারোশো ফুট উঁচু হবে। ট্রেইলটা পাহাড়কে ঘিরে বাম দিকে চলে গেছে, কিন্তু গেরিলারা সেদিকে যায়নি। তারা জঙ্গল কেটে পাহাড় চূড়ায় উঠেছে। তাদের কাটা পথটাকে এড়িয়ে চূড়ায় উঠে এল ওরা।

চূড়া ফাঁকা। গাছপালা আছে, খুব কম। ঝোপই বেশি। ঝোপ কাটা হয়নি, মাড়ানো হয়েছে। চূড়াটা প্রায় চারকোনা। নত হয়ে থাকা ঝোপের ওপর দিয়ে কিনারার দিকে ক্রল করে এগোল ওরা। চূড়ায় সরাসরি চাঁদের আলো পড়ায় স্লীপিং ব্যাগটা দেখতে পাওয়া গেল, তা না হলে চোখেই পড়ত না। ব্যাগের ভেতর কে যেন ছটফট করছে। বলা উচিত, ধস্তাধস্তি করছে। ভেতরে কি ঘটছে, প্রথমে রানার বোধগম্য হলো না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটা শব্দ হতে ঝট করে চোখ তুলে বৈশাখির দিকে তাকাল ও। মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে মেয়েটা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্লীপিং ব্যাগ থেকে খানিকটা দূরে, একটা ঝোপের দিকে তাকাল।

ঝোপের গায়ে একটা নয়, দুটো শার্ট আর দুটো ট্রাউজার ঝুলছে। অস্ত্রগুলো, দুটোই ব্রাউনিং রাইফেল, ঝোপের নিচে পড়ে রয়েছে। বৈশাখি হাসি থামিয়ে থো-থো করে থুতু ছিটাল। তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল রানা। তারপর ইঙ্গিত করল, মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে বলছে।

হাতের এ-কে/ফরটিসেভেনটা উল্টো করে ধরে সিধে হলো রানা, ব্যাগের ভেতর মাথা দুটো ঠিক কোথায় রয়েছে আন্দাজ করে পরপর দুটো বাড়ি মারল

বাঁট দিয়ে। মারা গেলে কিছু করার নেই, ও শুধু অজ্ঞান করতে চেয়েছে।

দুই ব্যাড়িতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল জোড়া প্রেমিক।

আবার ক্রল করে এগোল ওরা, চূড়ার কিনারায় পৌঁছুল। ঢালে গাছপালা কম, ঝোপই বেশি। চাঁদের আলোয় কিছুই নড়ছে না। ঢালের নিচে আবার শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। তারপর একটা পাহাড়। বেশি উঁচু নয়, তবে গায়ে পাশাপাশি তিনটে অন্ধকার গহ্বর দেখা যাচ্ছে। ওগুলো গুহা। গুহাগুলো অন্ধকার হলেও, বাইরে আগুন জ্বলছে। আগুনের পাশে মাত্র দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখা গেল। রানা আন্দাজ করল, গুহা পেয়ে যাওয়ায় তাঁবু টাঙানোর ঝামেলায় যায়নি গেরিলারা, রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে ভেতরে।

ওদের নিচের ঢালে কিছু না নড়লেও, সাবধানে নামতে হবে ওদেরকে। প্রহরীরা হয়তো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে বা ঝিমাচ্ছে। জঙ্গলটা ঘন হলেও, বেশি চওড়া নয়, পঞ্চাশ গজের মত হবে। ওখানেও পাহারা থাকার কথা। আকাশের দিকে তাকাল রানা, চাঁদের কাছাকাছি কোন মেঘ নেই। ওদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

সঙ্গে নাইট গ্লাস নেই, বিনকিউলার চোখে তুলে আগুনটার দিকে তাকাল রানা। লোক দু'জন গুহাগুলোর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। রান্না ও খাওয়াদাওয়ার কাজ সেরে গেরিলারা ঘুমাতে ঢুকেছে গুহার ভেতর। তিনটে গুহা, ভেতরে কত লোক আছে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আগুনের আভায় যতদূর দেখা গেল, কোথাও কোন অস্ত্র বা পেট্রলের ড্রাম চোখে পড়ল না।

বৈশাখি অস্ত্র চালাতে জানলে উপকারে লাগত। তা যখন জানে না, ঝুঁকি নিয়ে যা করার একাই করতে হবে রানাকে। কিভাবে কি করবে ভাবছে ও। বৈশাখিকে সঙ্গে নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে জঙ্গলে না হয় ঢুকল, তারপর? উল্টোদিকের কিনারায় বেরুলে গুহাগুলো একেবারে কাছে চলে আসবে, পঁচিশ গজের মধ্যে। গুহা তিনটে ভেতর দিকে সোজা এগিয়েছে, নাকি খানিক পর বাঁক নিয়েছে, বোঝার উপায় নেই। বাঁক নিয়ে থাকলে গেরিলারা সেটা ঘুরেই শোয়ার জন্যে জায়গা করে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে গ্রেনেড বিস্ফোরণে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

আগুন ধরানো হয়েছে কিছুটা উঁচু জমিনের ওপর, ওখান থেকে কোন চাকা বা ড্রাম গড়িয়ে দিলে সরাসরি গুহার ভেতর ঢুকে যাবে। কিন্তু পেট্রলের ড্রামগুলো নিশ্চয়ই গুহার ভেতর রাখা হয়েছে।

পিছিয়ে এল রানা। গেরিলা দু'জনের শার্ট ও ট্রাউজার সার্চ করল না, ঝোপের নিচেটা হাতড়াল। পাউচে ভরা আরও দু'জোড়া গ্রেনেড পেল ও। বৈশাখিকে ইশারায় কাছে ডেকে নিচু স্বরে ব্যাখ্যা করল কি করতে চায় ও।

নিচ থেকে আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো দেখা যেতে পারে, তাই ঢালের কিনারা থেকে শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা। খানিকটা নেমে আসার পর ক্রল করে এগোল। ওর নির্দেশ মত পিছনে নয়, ডান পাশে সমান্তরাল রেখায় রয়েছে বৈশাখি, তবে দু'জনের মাঝখানে ঝোপ পড়ায় মাঝে মধ্যে রানার দৃষ্টিপথের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সে।

ঢালের প্রায় গোড়ায় নেমে এসেছে ওরা, এই সময় ডান পাশে দশ-বারো হাত দূরে ঝাঁকি খেলো একটা ঝোপ, সেই সঙ্গে প্রথমে ফুঁপিয়ে উঠল বৈশাখি, তারপর নাকি সুরে কান্না জুড়ে দিল। এক নিমেষে বুঝে ফেলল রানা কি ঘটেছে। ঝোপের আড়ালে গেরিলারা পাহারা বসিয়েছে, তাদের কারও সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অভিনয় করছে বৈশাখি, উদ্দেশ্য রানাকে সাবধান করা।

বৈশাখির সাহায্য দরকার। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ছে না রানা। এর আগে দু'বার গার্ডদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের, কাউকে একা পায়নি, সঙ্গে আরেকজন ছিল। এখানেও দু'জন লোক থাকার কথা। প্রশ্ন হলো, বৈশাখি কি একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, নাকি দু'জনের সঙ্গেই? ধরতে পেরে সে বা তারা কি বৈশাখিকে সঙ্গে সঙ্গে জবাই করবে, নাকি জেরা করার জন্যে নিয়ে যাবে গুহার ভেতর, লীডারের কাছে?

'নকিব?' ঢালের একেবারে নিচ থেকে ভেসে এল ডাকটা। হালকাভাবে হলেও, বৈশাখির কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে লোকটা। রানা তাকে স্পষ্টই দেখতে পেল, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে, হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক রাইফেল। ওর হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা। লক্ষ্যস্থির করল বোতাম খোলা শার্টের ভেতর সোনার চেইনটা যেখানে ঝুলছে তার ঠিক বাম পাশে।

'এদিকে আয়, ডং!' রানার ডান পাশের ঝোপ থেকে সাড়া দিল সঙ্গী লোকটা।

নকিবের গলার আওয়াজ আর ডঙের অস্পষ্ট গোঙানি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, দুটো শব্দকে আলাদা করে চেনা গেল না। স্টিলেটো ডঙের হৃৎপিণ্ড ছিদ্র করে দিয়েছে। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ছুরির বাঁটটা ধরতে চাইলেও পারল না সে, সটান উপুড় হয়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ল।

'ডং!' আবার ডাকল নকিব, গলায় চাপা উত্তেজনা। 'জলদি আয়! খাসা একখানা মাল...'

ক্রল করে এগোচ্ছে রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে ম্যাশেটি। একটা ঝোপকে পাশ কাটাতেই লোকটাকে দেখতে পেল, নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। বৈশাখির ওপর চড়ে বসেছে সে, এরইমধ্যে খুলে ফেলেছে তার শার্টের বোতাম। চাঁদের আলোয় যুবতী নারীর বক্ষসৌন্দর্য তাকে যেন জাদু করেছে, অন্য কোনদিকে খেয়াল দেয়ার অবসর নেই।

লোকটার ঘাড়ের পিছনে এসে হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা। এখানে থানা-পুলিস বা কোর্ট-কাচারি নেই যে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে লোকটাকে গ্রেফতার করবে। শুধু অজ্ঞান করাটাও বোকামি হবে, কারণ জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে গোটা ক্যাম্পকে জাগিয়ে তুলবে। 'চোখ বন্ধ করো,' বিড়বিড় করল ও। বৈশাখি সত্যি সত্যি চোখ বন্ধ করল কিনা দেখার অপেক্ষায় থাকল না, লোকটার ঘাড়ের ওপর ম্যাশেটির একটা কোপ মারল। শুধু আহত করা উদ্দেশ্য নয়, তাই জোরেই মেরেছে।

শরীর থেকে লোকটাকে ফেলে দিয়ে উঠে বসল বৈশাখি। 'এত দেরি করবেন ভাবিনি...' শুরু করল সে।

'শ্‌শ্‌!' চুপ থাকতে বলল রানা। ম্যাশেটিটা ঘাসের ওপর ঘষে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করল। 'এসো।' ক্রল করেই ঢালের নিচে নামছে ও, বৈশাখি ওর পাশে থাকল। খানিকটা নামতেই প্রথম লাশটাকে দেখতে পেল ওরা। ম্যাশেটি কোমরে গুঁজে লাশের বুক থেকে ছুরিটা খুলে নিল রানা। হঠাৎ খেয়াল হতে স্থির হয়ে গেল, বিড়বিড় করে জানতে চাইল, 'তোমার ম্যাশেটি?'

'লোকটা বৈশাখিকে দেখার আগে বৈশাখিই তাকে দেখে ফেলে। রাইফেল তুলছে দেখে ম্যাশেটি ছেড়ে দিই হাত থেকে, সেটার ওপর দিয়ে হামা দিয়ে এগোই–বোঝাতে চেয়েছিলাম আমি নিরস্ত্র, পথ হারানো অসহায় একটা মেয়ে। সেটা ওখানেই পড়ে আছে।'

'দূর বোকা! যাও, নিয়ে এসো। লাশ দুটোর সঙ্গে গ্রেনেড পাবে, ওগুলোও নিয়ে আসবে।'

ঢালের নিচে রয়েছে রানা, সামনে ঘন জঙ্গল। এখান থেকে পাহাড়টা দেখা যায়, কিন্তু গুহা তিনটে চোখে পড়ে না। বৈশাখি ফিরে আসতে ম্যাশেটিটা চেয়ে নিল ও, নিচু গলায় বলল, 'খালি হাতে সামনে থাকো, ধরা পড়লে মেয়েদের সেরা অস্ত্রটা ব্যবহার করবে।'

'মেয়েদের সেরা অস্ত্র?' বৈশাখির গলায় খানিকটা সন্দেহ, খানিকটা রাগ, কিছুটা অভিমান।

'যৌবন নয়, কান্না,' হাসি চেপে ফিসফিস করল রানা। 'বাঙালী মেয়েদেরও এটাই সেরা অস্ত্র।'

'বৈশাখি তাহলে জানল রানা একজন বাঙালী। বাঙালী মহাশয় একটু একটু করে সুতো ছাড়েন।'

'আমি তোমার পিছনেই থাকব,' অভয় দিল রানা। 'জঙ্গলের বাইরে বেরুবে না, কিনারায় পৌঁছে থামবে।'

কিনারা পর্যন্ত কোন বিপদ হলো না। বৈশাখিকে পিছনে রেখে ঝোপের ফাঁক দিয়ে আগুন আর গুহাগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'আমার দু'পাশ আর পিছন দিকে খেয়াল রাখো,' বলে ম্যাশেটিটা ফিরিয়ে দিল।

জঙ্গলের কিনারা থেকে পাহাড়ের গুহা বড়জোর পঁচিশ গজ মত দূরে। আগুনটা জ্বলছে গুহা আর জঙ্গলের মাঝখানে। আগুনের আভা গুহার ভেতর পৌঁছায়নি, ফলে ভেতরে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। লোক দু'জন। ওদের কাছে এ-কে/ফরটিসেভেন রয়েছে, এবং বসে আছে জঙ্গলের দিকে মুখ করে।

মনস্থির করতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না রানা। গুলি করে লোক দু'জনকে মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে গুহার ভেতর গেরিলাদের ঘুম ভেঙে যাবে। একটা পথই খোলা আছে, পিন খুলে গুহার ভেতর যতগুলো সম্ভব গ্রেনেড ফেলা। তারপর কি ঘটবে দেখার অপেক্ষায় না থেকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো।

বৈশাখির হাতে পাঁচটা গ্রেনেড ধরিয়ে দিল রানা, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল দাঁত দিয়ে ধরে কিভাবে পিন খুলতে হয়। কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'প্রতিবার একটা করে গ্রেনেডের পিন খুলবে, খুলেই আমার হাতে দেবে।'

প্রতি মুহূর্তে দুটো করে গ্রেনেডের পিন খুলল ওরা। রানা নিজের হাতেরটা ছোঁড়ার পর বৈশাখির হাতেরটা ছুঁড়ল। প্রথমে একটা গুহাই টার্গেট করেছে ও, দুটো গ্রেনেডই আগুনের ওপর দিয়ে উড়ে গেল, সোজা ঢুকে পড়ল অন্ধকার গহ্বরে। পাঁচ সেকেন্ডও পেরোয়নি, আরও দুটো গ্রেনেড পাশের গুহায় ঢুকল।

এক নম্বর অন্ধকার গহ্বর থেকে চোখ ঝলসানো কমলা আগুন বিস্ফোরিত হলো। রানার হাত থেকে আরও একজোড়া গ্রেনেড বেরিয়ে গেছে। তৃতীয় গুহার মুখ বাকি দুটোর চেয়ে বেশি চওড়া, তাসত্ত্বেও মাত্র একটা গ্রেনেড ভেতরে ঢুকল, অপরটা বাইরের দেয়ালে লেগে গড়িয়ে ফিরে এল আগুনটার কাছে।

দ্বিতীয় গহ্বর আক্ষরিক অর্থেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সম্ভবত দুটো গ্রেনেডই গুহার ঠিক ভেতরে বিস্ফোরিত হয়েছে, প্রবেশপথের একেবারে কাছে, ফলে পাথর আর মাটি ধসে পড়ায় গুহার মুখটাই বন্ধ হয়ে গেল।

শেষবার ছোঁড়া গ্রেনেড জোড়া দু'জায়গায় পড়লেও, ওগুলোই চমকপ্রদ কেরামতি দেখাল। আগুনের সামনে পড়েছিল একটা, অপরটা গুহার ভেতরে। আগুনের ধারে বসা লোক দু'জন ইতিমধ্যে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় গুহার দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। জঙ্গলের আরও দু'দিক থেকে চারজন গার্ড ছুটে আসছে তাদের দিকে, প্রত্যেকের হাতে এ-কে/ফরটিসেভেন। চারজন লোক এক হতেই ওদের সামনে পড়া গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো। হাত, পা, পেট, বুক, মাথা সব একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল; শতটুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একই সময়ে বিস্ফোরিত হয়েছে গুহার ভেতর পড়া গ্রেনেডটাও। সেটার ফলাফল বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ একটা গ্রেনেড ডজন ডজন গ্রেনেডের ভূমিকা পালন করেছে। আওয়াজটা তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, হঠাৎ কামান দাগার মত একটা আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা। তারপর একের পর এক ওই কামান দাগার মত আওয়াজ শোনা গেল। অসংখ্য মানুষের কাতর আর্তনাদ ভেসে আসছে, শুধু মাত্র প্রথম গুহা থেকে আহত ও রক্তাক্ত কিছু মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। সুযোগ পেলে এরাই ওদের পিছু নেবে, কাজেই সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে টার্গেট প্র্যাকটিসের ভঙ্গিতে সব ক'টাকে ফেলে দিল ও। তৃতীয় গুহার ভেতরে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, পেট্রলের সবগুলো ড্রাম বিস্ফোরিত হয়েছে। শুধু দ্বিতীয় গুহার দিকে আরও একজোড়া গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা, উদ্দেশ্য মাটি আর পাথর আরও খানিকটা ধসিয়ে দিয়ে মুখটা আরও ভালভাবে বন্ধ করে দেয়া।

বারুদ আর পোড়া মাংসের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। বৈশাখির হাত ধরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল রানা। ঘুরপথ ধরে জলাভূমির অপরপ্রান্তে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, ধরতে হবে পালের গোদাটাকে। হাতে সময় খুব কম।

চার

জলাভূমির অপরপ্রান্তে পৌঁছুতে রাত দুটো বেজে গেল। রানার মতই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত বৈশাখি, কিন্তু কোন অভিযোগ করছে না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, পিছনে কোন শত্রু নেই, তাসত্ত্বেও ওরা রাতে কেন হাঁটছে? রানা জবাব দিয়েছে, সোলায়মান অনেক এগিয়ে আছে, কাজ সেরে পালাবার আগেই তাকে ধরতে হবে।

আড়াইটার দিকে নিজেই আর পারল না রানা, ক্লান্তির কাছে হার মেনে ট্রেইলের পাশে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। যুক্তিও এখানে থামার কথা বলে। দিনের আলো ছাড়া চোখে পড়বে না জলাভূমি থেকে কোথায় আবার ডাঙায় বা জঙ্গলে ঢুকেছে সোলায়মান।

আগুন জ্বালতে নিষেধ করল ও। রাকস্যাক থেকে শুকনো খাবার বের করে খেলো ওরা। স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল, কোন কথা হলো না, এমনকি নড়াচড়াও করল না, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা হতে। ব্যাগ থেকে বেরুতে যাবে রানা, কিন্তু বৈশাখির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। বিশ মিনিট পর একসঙ্গেই বেরুল ওরা, চোখ রাঙিয়ে রানাকে পিছন ফিরতে বলল বৈশাখি। কাপড়চোপড় পরছে সে, প্রায় নির্দেশের সুরে বলল, 'দেখে আসুন, কাছাকাছি কোন ঝরনা পান কিনা। বৈশাখি গোসল করতে চায়।'

গোসল ও নাস্তা সেরে আবার রওনা হলো ওরা। পাঁচ মিনিটও কাটল না, রানার পিছনে একটা মামবা দেখতে পেয়ে ম্যাশেটি দিয়ে কোপ মারল বৈশাখি। রানা দেখতে পায়নি, ওর পায়ের এক গজের মধ্যে চলে এসেছিল সাপটা। মামবা গোক্ষুরেরই জাত, কামড়ালে বড়জোর পাঁচমিনিট বাঁচে মানুষ। সাপটাকে দেখে বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল রানা, সময়মত দেখতে না পাওয়ায় নিজেকে তিরস্কার করল। বৈশাখি সম্পূর্ণ নির্বিকার, ম্যাশেটির ফলা দিয়ে সাপটাকে তুলে ছুঁড়ে দিল একটা ঝোপের দিকে, রানার চোখে চোখ রেখে সকৌতুকে হাসল। 'হাঁটার সময় সাবধানে থাকবেন, মশাই। প্রতিবার বৈশাখি আপনাকে রক্ষা করবে, এমন আশা করবেন না।'

রিমাউ ছাড়া আর কিছুকে মোটেও ভয় পায় না মেয়েটা। সেটাও এক ধরনের কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ট্রেইলটা খুঁজে পাওয়া গেল। জলাভূমি থেকে এই ট্রেইলেই উঠেছে সোলায়মান আর তার গেরিলারা। বৈশাখিকে একটু চিন্তিত দেখে কারণটা জানতে চাইল রানা। উত্তরে বৈশাখি বলল, 'ম্যাপ দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি ভয় পাচ্ছি।'

ম্যাপের ভাঁজ খুলে রানা দেখল, তেরেনগানু রাজ্যের ওপর দিয়ে তিন নম্বর

হাইওয়ে চলে গেছে, সেই হাইওয়ের খুব কাছাকাছি রয়েছে ওরা। ট্রেইলটা উত্তরদিকে এগিয়েছে, ওদিকে ছোট্ট শহর উলু চালোক পড়বে।

উলু চালোক তিন নম্বর হাইওয়ের পাশেই। তারপর চালোক নদী, শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে। নদী থেকে দক্ষিণ চীন সাগর আরও কাছে, খুব বেশি হলে তিন কি সাড়ে তিন কিলোমিটার। বৈশাখির ভয়টা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হলো ও।

'বুঝলাম না।'

'সোলায়মান শহর দেখলেই আক্রমণ করে,' বলল মেয়েটা। 'ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, ব্যাংক লুঠ করে, থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে যায়।'

'কিন্তু আমার ধারণা, এবার অন্তত সোলায়মান শহরে ঢুকবে না। সে একটা বিশেষ কাজে উপকূলে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক,' বলল বৈশাখি। 'আমরাও তাহলে শহরটাকে পাশ কাটিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ।'

সামনে তিন কি সাড়ে তিন কিলোমিটার জঙ্গল, সেটা পেরিয়ে হাইওয়েতে পড়বে ওরা। আবার রওনা হয়ে দেড় কিলোমিটারের মত এগিয়েছে, ট্রেইলের এক পাশে দেখা গেল হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র সর্পমন্দির। বৈশাখি যে কুসংস্কারে কতটা বিশ্বাসী, আরেকবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সর্পমন্দিরে সে নিজে তো ঢুকবেই না, রানাকেও ঢুকতে দেবে না।

ওরা থেমেছে জঙ্গলের আড়ালে, চোখে বিনকিউলার তুলে মন্দিরটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা। ট্রেইল থেকে একশো গজ দূরে ওটা, ফাঁকা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা ফাঁকা হলেও, আশপাশের ঝোপ এত ঘন, পাথুরে কাঠামোটা কোন রকমে চোখে পড়ে। ট্রেইল থেকে ঝোপ-ঝাড় কেটে নতুন ও তাজা একটা পথ তৈরি করা হয়েছে মন্দির পর্যন্ত। কাজটা নিশ্চয়ই গেরিলাদের। কারণটা কি হতে পারে? সোলায়মানের তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুব উপকূলে পৌঁছুতে চাওয়ার কথা। পরিত্যক্ত একটা মন্দিরে ঢুকে কেন সে সময় নষ্ট করবে?'

পাশে উবু হয়ে বসে সারাক্ষণ ফিসফাস করছে বৈশাখি। নির্দেশ অমান্য করে কেউ যদি মন্দিরে একবার ঢোকে, তার আর রক্ষে নেই। মৃত্যু অনিবার্য। এক কান দিয়ে কথাগুলো শুনছে রানা, সেই সঙ্গে ভাবছে এই পরিস্থিতিতে ওর করণীয় কি। সিদ্ধান্ত নিল সোলায়মান কি কারণে মন্দিরে ঢুকেছিল, এটা জানা দরকার। আর জানতে হলে ওকেও ভেতরে ঢুকতে হবে। জঙ্গলের কিনারা থেকে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় ক্যাম্প ফেলেছিল গেরিলারা। কোথাও কোন লাশ দেখা যাচ্ছে না, কাজেই সর্পদেবতার অভিশাপ অন্তত তার বা গেরিলাদের বেলায় কাজ করেনি। প্রশ্ন হলো, ঠিক এখানেই কেন ক্যাম্প ফেলল সোলায়মান, জঙ্গলের ভেতর চারদিক ঢাকা নিরাপদ এত জায়গা থাকা সত্ত্বেও? ফাঁকা জায়গাটাই বরং গেরিলাদের জন্যে বিপজ্জনক। কি কারণ?

'মালয়ীদের জন্যে সর্পমন্দির নিষিদ্ধ,' পাখি পড়ানোর মত করে একই কথা বারবার বলছে বৈশাখি। 'বৈশাখি আপনার ভাল চায়, পরদেশী। ওখানে শত শত, হাজার হাজার সাপ আছে। আমি যে মামবাটা মেরেছি, ওটার চেয়েও মারাত্মক।

আমরা মন্দিরে ঢুকব না, ঠিক আছে? মন্দিরের কথা আমরা মন থেকে মুছে ফেলব, হ্যাঁ?'

'তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে,' বলল রানা। 'ভেতরে আমি একা ঢুকব।'

রানার বাহু খামচে ধরে শিউরে উঠল মেয়েটা। 'বৈশাখি সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে, পরদেশী। ভয় পাচ্ছে আপনার জন্যে।' এরপর সে এক হাজার একটা কারণ দেখাতে লাগল, কেন রানার মন্দিরে ঢোকা উচিত নয়। মন্দিরটা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন হাজার বছর ধরে। সর্পদেবতার নির্দেশ অমান্য করে যে-ই ভেতরে ঢুকেছে, তাকে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি। সেমাং আদিবাসির লোকেরা রাতের বেলা সাপগুলোকে খাবার দিতে আসে, সেই খাবারে ড্রাগ মেশানো থাকে। সাপগুলো ভরপেট খেয়ে সেমাংদের সঙ্গে কথা বলে, জঙ্গলের সমস্ত রহস্য ফাঁস করে দেয়। বহুকাল আগে সর্পমন্দিরের ভেতরে সোনার তৈরি বিশাল আকৃতির অজস্র সাপ ছিল, দেবতাদের মূর্তি। তারপর মাঙ্কিম্যানরা এল। মন্দিরের সমস্ত সর্পমূর্তি চুরি করে নিয়ে গেল তারা। এই চুরি করার ফল কি হলো, মালয়েশিয়ার সবাই তা জানে। মাঙ্কিম্যানরা সবাই অপঘাতে মারা পড়ল।

মাঙ্কিম্যান! মালয়ী আর চীনারা মাঙ্কিম্যান বলতে সাধারণত জাপানীদের বোঝায়। তারমানে কি জাপানীরা এদিকে এসেছিল? মন্দিরটায় হয়তো সত্যি সাপের মূর্তি ছিল, জাপানীরা সেগুলো লুঠ করে নিয়ে গেছে। যুদ্ধের নিয়মই তো এই, যা পাও লুঠ করো।

রানা বাধা দিচ্ছে না, বরং কান পেতে শুনছে কথাগুলো। বৈশাখি অনেক কথাই বলছে, কিন্তু তার মাথায় এত বুদ্ধি নেই যে বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে আপাত বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে বের করবে। মন্দিরে সোনা ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা উপকূলে সাবমেরিন রেখে জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছিল, মন্দির থেকে সোনা নিয়ে উপকূলে পৌঁছে তারা দেখে সাবমেরিন ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। সোলায়মান ঘটনাগুলো মেলাতে পেরেছে বৈশাখির দাদুর মুখ খুলিয়ে।

বৈশাখির দাদু জয়নাল আব্বাসী নিজেও একজন গেরিলা ছিলেন, জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মন্দিরটা লুঠ হতে দেখেছেন, দেখেছেন সোনার তৈরি সাপের মূর্তি নিয়ে জাপানীরা উপকূলের দিকে যাচ্ছে। যা-ই তিনি দেখে থাকুন, কথাটা গোপন করে রাখেন–ফাঁস করে ফেলতেন নিজের অজান্তে ঘুমের মধ্যে, যখন মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকত না। গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজনরা জিজ্ঞেস করলেও তিনি স্বীকার করতেন না স্বপ্নে কি দেখতেন। কিন্তু সোলায়মান নির্যাতন করায় সত্য প্রকাশে বাধ্য হন।

ধাঁধার একটা সমাধান ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

চোখ ভরা পানি নিয়ে রানাকে বিদায় জানাল বৈশাখি, যেন জীবনে আর কখনও পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে না। রানা রওনা হতেই করুণ বিলাপের সুরে গান জুড়ে দিল, সর্পদেবতাকে অনুরোধ করছে তার পরম হিতৈষী পরদেশীকে তিনি যেন কৃপা করেন–অভিশাপ তো আর ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়, কাজেই দু'একটা সাপ কামড় দিলে দিক, কিন্তু সেগুলোর দাঁতে যেন বিষ না

থাকে।

রানা রওনা হলো নতুন একটা পথ তৈরি করে। গেরিলাদের কাছে গ্রেনেড আছে, তাদের তৈরি পথের ওপর দু'একটা গ্রেনেড-ফাঁদ রেখে গিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফাঁকা জায়গাটায় পৌছুতে আধ ঘণ্টার মত লাগল ওর।

ক্যাম্প তুলে চলে যাবার সময় জায়গাটা পরিষ্কার করেনি গেরিলারা। তারা যে ব্যস্ত ছিল, এটা তার আরেকটা প্রমাণ। কয়লা থাকলেও, আগুনটা কয়েক দিন আগেই নিভে গেছে। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে টিনের খালি কৌটা। একটা ল্যাট্রিনও দেখল রানা। ফাঁকা জায়গায় বেরুবার আগে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকল ও, পাখি আর বানরদের চেঁচামেচি কমে আসতে বিপজ্জনক কোন আওয়াজ হয় কিনা শোনার জন্যে কান পাতল।

বিশ মিনিট পর পরিবেশ শান্ত হলো। রানাকে নড়তে না দেখে বানরগুলো চুপ করল, দেখাদেখি পাখিরাও প্রতিবাদ করছে না। ঝুঁকি নিয়ে ঝোপ থেকে বেরুতে যাবে ও, ওর দশ ফুট সামনের একটা গাছ থেকে নিচে খসে পড়ল একটা পাইথন। রাক্ষুসে সাপ, প্রায় বিশ ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

এ-কে/ফরটিসেভেন কাঁধ থেকে ঝুলছে, ওয়ালথারটা হাতে, সতর্ক পা ফেলে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল রানা। প্রসারিত ডালপালার ফাঁক-ফোকর গলে নেমে আসা রোদ লাগছে গায়ে। পশ্চিম আকাশের কোথাও থেকে মেঘ ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ।

ল্যাট্রিনে ঢুকে বিষ্ঠা পরীক্ষা করল রানা, আন্দাজ করল ওদের চেয়ে অন্তত তিন দিন এগিয়ে আছে গেরিলারা। খালি টিনের কৌটাগুলো নেড়েচেড়ে দেখল—আমেরিকা থেকে পাঠানো খাদ্যবস্তু, থাইল্যান্ডে টিনজাত করা হয়েছে। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, সিআইএ সাহায্য করছে সোলায়মানকে। থাইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য আছে, সিআইএ-র এজেন্টরাও আছে, নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সে।

বেল্ট থেকে টর্চটা বের করল রানা, মন্দিরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। টর্চের সাদা উজ্জ্বলতা আলোকিত করে তুলল মেঝে আর দেয়াল। সাপের গন্ধে ঘিনঘিন করে উঠল গা।

মেঝেতে পড়ে আছে ওগুলো। সংখ্যায় এত বেশি যে গুনে শেষ করা যাবে না। ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা, বন্ধুবর পাইথন এককোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। এইমাত্র ভোজনপর্ব শেষ করেছে, মন্দিরে ঢোকার পরপরই, শরীরের মাঝামাঝি জায়গাটা এতটাই ফুলে আছে, গোটা একটা শুয়োর ছানা গিলে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দিনে নয়, ছানাটাকে নিশ্চয়ই কাল রাতে শিকার করে মন্দিরের ভেতর ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল—দিনে হলে ওটার আর্তনাদ শুনতে পেত ওরা। শুয়োর হোক বা অন্য কিছু, খাবারের সঙ্গে ড্রাগ মেশানো ছিল। বাকি সব সাপের আড়ষ্ট ভাবও সে-কথাই বলে, খাবারের সঙ্গে ওগুলোকেও ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে।

ওর প্রতি কোন মনোযোগ নেই ওগুলোর। প্রাচীন কড়িকাঠ আর থাম ঝুলছে

কয়েকটা, বেশিরভাগই মেঝের চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। মামবা তো আছেই, তারও অন্তত বিশ প্রজাতির সাপ রয়েছে। একজোড়া গোক্ষুরকে পাশ কাটানোর সময় সতর্ক থাকল রানা, কিন্তু ওগুলো হিসহিসও করল না, ফণাও তুলল না। ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সাপগুলো ওর জন্যে কোন বিপদ নয়। সবগুলো নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমাচ্ছে। ভয় শুধু এগুলোর রক্ষককে, তারা হয়তো দূর থেকে মন্দিরের ওপর নজর রাখছে।

মন্দির ছেড়ে বাইরে বেরুবার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা, তা সত্ত্বেও দেরি করছে। কেন যেন মনে হলো, ওর দেখা উচিত এমন কিছু একটা আছে এখানে। মন্দিরের গা ছমছমে পরিবেশ ওকে যেন কি বলতে চায়।

তীব্র বোটকা গন্ধ সহ্য করার মত নয়, দম যতটা সম্ভব বন্ধ করে দেয়ালের গায়ে টর্চের আলো ফেলল রানা। আলোটা এঁকেবেঁকে উঠে গেল, একটা খাঁজ অনুসরণ করে। প্রায় পঞ্চান্ন বছরের পুরানো, চার দেয়ালে চারটে খাঁজ। প্রতিটি পঞ্চাশ ফুট লম্বা, গভীরতা ছয় ইঞ্চির কম নয়। আঁকাবাঁকা আকৃতি দেখেই বোঝা যায়, সোনার তৈরি সাপ ছিল ওখানে, খুলে নেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রচুর নিরেট সোনা, জাপানীরা নিশ্চয়ই খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠেছিল।

তারপর গর্তটা দেখতে পেল রানা। ভাবল, দেখতে না পেলেই ভাল হত, কারণ হাতছানি দিয়ে ওটা যেন ডাকছে ওকে।

সরাসরি ওর উল্টোদিকের দেয়াল চৌকো একটা ফাঁক। সাধারণ দরজার তুলনায় খানিকটা খাটো আর সরু। এগিয়ে এসে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল রানা। ভেতরে যতই উত্তেজিত হোক, বাইরে সম্পূর্ণ শান্ত ও, এক চুল নড়ছে না। ওর চারধারে মোচড় খাচ্ছে আড়ষ্ট সরীসৃপ, কোন কোনটার গতি এত মন্থর যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখে ধরা পড়ে। টর্চের আলোয় ধাপগুলো দেখা যাচ্ছে; সেখানেও পড়ে আছে কুণ্ডলী পাকানো সাপ। সাবধানে পা ফেলছে রানা। নেশাগ্রস্ত হলেও, প্রতিটি সাপ বিষাক্ত, গায়ে পা পড়লে কামড় দেয়ার শক্তিও নেই, এমন ভাবা বোকামি। ধাপগুলো শেষ হয়েছে একটা শ্যাফটে, দেখতে অনেকটা মাইন শ্যাফটের মতই। মাইন? তাহলে কি এই শ্যাফট বা টানেল থেকে তোলা হয়েছিল সোনা? মন্দিরের নিচে সোনার খনি ছিল বা এখনও আছে?

টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। ওয়ালথারের ট্রিগারে আঙুল, সেফটি ক্যাচ অফ করা। টানেলটা হঠাৎ ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁক ঘুরতেই তাকে দেখতে পেল।

ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সে বহুকাল আগে মারা গেছে। বাদামী ও খয়েরি রঙের কংকাল, জয়েন্ট থেকে হাড়গুলো খুলে প্রায় একটা স্তূপের আকৃতি পেয়েছে। হাড়ের ওই স্তূপে কি যেন চকচক করে উঠল টর্চের আলো পড়ায়। কাঁকন বা ব্রেসলেট, কব্জির হাড়ে জড়ানো। হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতেই হাড়টা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। জিনিসটা হাতে নিতে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো রানার। দুই হাঁটুর মাঝখানে টর্চটা রেখে ব্রেসলেটটা পরীক্ষা করল। হান্টিং নাইফ দিয়ে ঘষল একটু।

সোনা নয়! প্ল্যাটিনাম!

ব্রেসলেটটা পকেটে ফেলে শ্যাফট থেকে বেরিয়ে এল রানা। জঙ্গলে ফিরে এসে বৈশাখিকে বলল না কি পেয়েছে। ও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে, তাতেই মেয়েটা খুশি, কি দেখেছে জানতেও চাইল না। প্যাকটা কাঁধে ঝোলাল সে, মাথায় চড়াল পাম গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হ্যাট, তারপর হন হন করে ট্রেইল ধরে এগোল।

কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'খুদে লোকজন তাকিয়ে ছিল। আমাদেরকে দেখেছে। আপনি মন্দিরে ঢোকার পর চিঁ-চিঁ করছিল। সম্ভবত বৈশাখিকে চেনে বলেই কি করা উচিত বুঝতে পারেনি।'

'ওরা কি পিছু নেবে? ক্ষতি করবে আমাদের?'

'ওদের এলাকা ছেড়ে চলে যাই কিনা দেখবে। চলে গেলে কিছু বলবে না।'

'খুদে লোকজন···কারা ওরা?'

'ওরা সেমাং আদিবাসি। ব্লো পাইপ ব্যবহার করে। খুদে তীর বেরোয় ওটা থেকে, বিষাক্ত। মামবা ধরে ওরা, বিষ বের করে গাছের আঠার সঙ্গে মিশিয়ে তীরে লাগায়। গায়ে বিঁধলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন।'

সেমাংরা যে নজর রাখছে, রানাও তা টের পেল। তবে খুব বেশি দূর পিছু নিয়ে এল না তারা। এক কি দেড় কিলোমিটার হাঁটার পর বৈশাখি জানাল, 'আর কোন বিপদ নেই।'

সেই থেকে কেমন যেন গম্ভীর আর আনমনা হয়ে গেল মেয়েটা। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিল ঠিকই, কিন্তু ইংরেজি বলা একদম বন্ধ করে দিয়েছে।

রাত একটু বাড়তে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল ওরা। সিগারেট আর খাবে না বললেও, আবার একটা চাইল বৈশাখি। আপত্তি না করে দিল রানা। মেয়েটা অন্যমনস্ক, লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার প্রেমিক, নেয়ামত। তার সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক হয়েছিল?'

'সম্পর্ক মানে?'

প্রশ্নটা করে বিপদে পড়ে গেছে রানা। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে জানতে চাইল, 'মানে, বিয়ে হয়েছিল কিনা?'

বৈশাখি জবাব দিল না, চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। যেন বলতে চায়, বিয়ে হলে তো নেয়ামতকে স্বামী বলে সম্বোধন করতাম, তা কি বলেছি?

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় রানা বলল, 'না, মানে, জানতে চাইছিলাম যে ধর্মীয় মতে না হলেও, জঙ্গল বা প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখেও কি তোমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক হয়নি?'

হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে উঠল, একটা হাত রাখল বৈশাখি নিজের বাম বুকে। 'সাকিট! সাকিট! সাকিট, সিনি।'

ভাষান্তর করলে কথাগুলো এরকম দাঁড়ায়, 'ব্যথা! ব্যথা! হৃদয়ে বড় ব্যথা!'

সেই মুহূর্তে একটা ভুল করে বসল রানা। একটা হাত দিয়ে তাকে জড়াল ও, চুলে হাত বুলাল, চুমো খেলো কপালে। ওকে ভুল বুঝল বৈশাখি, তবে সেটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। কাঁধ থেকে প্যাকটা নামিয়ে রানাকে টেনে ট্রেইলের এক

পাশে সরিয়ে আনল, একদিকে নিঃশব্দে কাদছে, আরেক দিকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলছে রানাকে।

অবোধ বালিকা অথবা অকস্মাৎ বৃষ্টির মত আচরণ তার, রানাকে হতচকিত করে তুলল। ভাবাবেগ এতই প্রবল যে কি করছে নিজেও যেন জানে না। রানার আড়ষ্ট ভাব কাটেনি, সেটা হঠাৎ বুঝতে পেরে ভারি লজ্জা পেল মেয়েটা, ঢিল পড়ল পেশীতে, ঘাসের ওপর শুয়ে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল।

খানিক পর আবার তাকে কাছে টেনে নিল রানা।

আরও বিশ মিনিট পর রওনা হলো ওরা, বৈশাখি এখন খুশি ও সন্তুষ্ট। অনেকক্ষণ পর আবার ইংরেজি বলছে। 'পরদেশী, তোমার একটা খারাপ গুণ হলো, বিপদের পরোয়া করো না। আর আমার খারাপ গুণ হলো, ব্যথা ভুলে থাকতে পারি না। একটা ব্যথাই জীবনটাকে নরক বানিয়ে রেখেছে। আরেকটা ব্যথা–তোমার মৃত্যু–আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'কে বলল আমি মারা যাব?'

'তাহলে কথা দিচ্ছ? অন্তত বৈশাখির চোখের সামনে তুমি মরতে পারবে না।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।' খানিক পর রানা আবার বলল, 'তাহলে তুমিও কথা দাও, আমাকে বিপদে পড়তে দেখলে ধৈর্য ধরবে, বোকার মত কোন ঝুঁকি নেবে না।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল বৈশাখি। 'দিলাম কথা, তবে এ-ও আমি জানি যে তুমি সঙ্গে যতক্ষণ আছ, আমার কোন বিপদ হবে না–আমাকে তুমি বাঁচাবে।

সেদিন রাতে স্লীপিং ব্যাগে ঢোকার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ল বৈশাখি, রানার গালে গাল ঠেকিয়ে, কিন্তু আরও অনেকক্ষণ জেগে থাকল রানা।

প্ল্যাটিনাম! কিন্তু তাহলে সোনার গল্পটা ছড়াল কিভাবে? গল্প হোক বা কিংবদন্তী, সবাই জানে সর্পমন্দির থেকে সোনা লুঠ করে নিয়ে গেছে জাপানীরা। রহস্যটা পরিষ্কার হলো না। এক সময় অন্য প্রসঙ্গ ফিরে এল মাথায়।

বৈশাখি যাদেরকে খুদে লোকজন বলছে, সেমাংরা ওই মন্দির বা সর্পমূর্তি, তৈরি করেনি। তারা ওটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। প্রকৃত নির্মাতারা ইতিহাসের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছে বহু শতাব্দী আগে। হারিয়ে যাওয়া কোন সভ্যতার অংশবিশেষ ওই মন্দির, সম্ভবত কয়েক হাজার বছরের পুরানো। তারা একটা প্ল্যাটিনাম খনি আবিষ্কার করে। জানত কিভাবে খনি থেকে প্ল্যাটিনাম বের করতে হয়।

তো? রানা নৃবিজ্ঞানী নয়। এই মুহূর্তে ওর হাতে রয়েছে গুরুতর একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করার দায়িত্ব। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে মনে হলো, দায়িত্বটা পালন করার সুযোগ ঘনিয়ে এসেছে।

পরদিন গোধূলিবেলায় একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, নাকে সাগরের গন্ধ পেল। সশব্দে বাতাস টেনে বৈশাখি বলল, 'লাউট!'

তিন নম্বর হাইওয়ে পেরিয়েছে ওরা দুপুরে, উলু চালোক শহরটাকে দুই কিলোমিটার ডানে রেখে। নদীর নামও চালোক, বাঁশ কেটে ভেলা বানিয়ে সেটাও

পার হয়ে এসেছে পড়ন্ত বিকেলের দিকে।

উপকূল পর্যন্ত আর কোন গ্রাম বা শহর নেই, শুধুই বনভূমি আর পাহাড়। বৈশাখিকে সাবধান করে দিল রানা, 'এখন থেকে আরও দেখেশুনে এগোতে হবে।' দু'জনেই জানে, সোলায়মান কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্প ফেলেছে।

আরও আধ ঘণ্টা পর আরেকটা ক্যাম্পসাইট পাওয়া গেল, এলিফ্যান্ট ট্রেইলের ঠিক পাশেই। যে-কোন কারণেই হোক, সোলায়মানের সাহস বেড়ে গেছে। ক্যাম্পের ভেতর তিন জায়গায় আগুন জ্বালা হয়েছিল। জীপগাড়ির চাকার দাগ দেখা গেল মাটিতে।

এবার রানা জঙ্গলের ভেতর খানিকটা পিছিয়ে এল। বৈশাখিকে রাতের খাবার তৈরির কাজ দিয়ে ফিরে এল সোলায়মানের ক্যাম্প সাইটে। ভেতরে ঢোকার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকল ও। জীপগুলো আকাশ থেকে পড়েনি।

ক্যাম্পে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে চাকার দাগ। দাগ অনুসরণ করে মাইলখানেক এগোল রানা। কোটা বারু থেকে এই জায়গার দূরত্ব প্রায় একশো কিলোমিটার। জীপগুলো ওদিক থেকেই এসেছে, তবে তিন নম্বর হাইওয়েতে একটা পর্যায় পর্যন্ত ছিল ওগুলো, তারপর সেকেন্ডারি একটা রোড ধরে উপকূলের দিকে রওনা হয়। নদী পেরুবার সুযোগ পায়নি, কারণ চালোক-এর ওপর কোন ব্রিজ নেই। সেকেন্ডারি রোড ধরে উপকূলবর্তী শহর পেনারেক হয়ে নদীটার তীর ঘেঁষে ক্যাম্পসাইটে পৌঁছায়। ক্যাম্পসাইটটা সাগর থেকে এখনও কয়েক কিলোমিটার পিছনে। একদল লোক কোটা বারু থেকে সোলায়মানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। প্রথমে তারা এলিফ্যান্ট ট্রেইল খুঁজে বের করে, তারপর ক্যাম্পসাইট। কিন্তু কেন? কি নিয়ে এসেছিল তারা? সাপ্লাই? ইনফরমেশন? নতুন রিক্রুট?

ক্যাম্পসাইটে ফিরে এসে আবার জায়গাটা সার্চ করল রানা। প্রথমবার চোখে পড়েনি, দ্বিতীয়বার পড়ল। এর আগের ক্যাম্পগুলোয় রানা লক্ষ করেছে, সোলায়মান কোন কিছু গোপন করতে চায়নি। সেজন্যেই এখানে গোপন কিছুর খোঁজ করেনি ও। প্রথমবার দেখতে না পাবার সেটাই কারণ।

ল্যাট্রিনের ময়লা যথেষ্ট তাজা। ওটার পিছনের ঘাস বেশ কিছুদূর নুয়ে আছে। ভাল করে না তাকালে দেখতে পাবার কথা নয়। পিছু নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে এল রানা, ম্যাশেটি দিয়ে ডালপালা কেটে। আধ মাইল এগোবার পর নতুন খোঁড়া গর্তটার দেখা পাওয়া গেল। মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যাশেটি দিয়ে খুঁড়তে কোন সময়ই লাগল না।

খয়েরি রঙের অনেকগুলো কার্ডবোর্ড কার্টন। কিছু বড় আকৃতির, কিছু ছোট। ছোটগুলোয় ছিল রেডিও পার্টস। দাতো সোলায়মান আমেরিকানদের একটা পুরানো আর্মি ট্র্যান্সিভার ব্যবহার করছে।

ওয়াসিম রানাকে তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল। সোলায়মানের রেডিও নষ্ট থাকায় থাই স্টেশনে বসে থাকা সিআইএ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি সে। নতুন পার্টস পাবার পর রেডিওটা সচল হবে, প্রয়োজনে রিইনফোর্সমেন্ট চাইতে পারবে। এটাই তার সাহস বেড়ে যাবার কারণ।

রানার মনে একটা ইচ্ছা জাগল। সিআইএ-র যে কর্মকর্তা সোলায়মানকে সাহায্য করছে, তার পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত। আরও ভাল হত মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে। অতীতে সিআইএ-কে অনেকবার সাহায্য করেছে ও। আজ উল্টো কিছু করার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে না।

বড় কার্টনগুলো আগ্রহী করে তুলল রানাকে। ওগুলোর গায়ের লেবেল পড়ে জানা গেল কি ছিল ভেতরে। স্কুবা ইকুইপমেন্ট!

চারটে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুবা-ডাইভিং আউটফিট–ট্যাংক, ফিন, মাস্ক। অ্যাকুয়া-আর্ট কোম্পানীর তৈরি, আমেরিকার ওহাইয়ো থেকে এসেছে। কার্টনগুলো গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিল রানা, ভাবছে। রেডিও নষ্ট, সোলায়মান অর্ডার দিল কিভাবে? বৈশাখিদের গ্রাম থেকে রওনা হবার সময়ই ছোট একটা গ্রুপকে কোটা বারুর দিকে পাঠায় সে। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র উত্তর।

ডুবে যাওয়া জাপানী সাবমেরিন সম্পর্কে রানার মনে আর কোন সংশয় নেই। সোনা? আপনমনে মাথা নাড়ল ও। ওর পকেটের ব্রেসলেটটা নিখাদ প্ল্যাটিনাম। বাজি ধরে বলতে পারে, মন্দিরের দেয়ালে যে খাঁজগুলো দেখে এসেছে, সেগুলোও ভরা ছিল প্ল্যাটিনামে–সর্পমূর্তির আদলে। সেক্ষেত্রে সোনার গল্পটা ছড়াল কিভাবে?

এই প্রশ্নের জবাব হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। সোলায়মানের ক্যাম্পসাইট থেকে বেরিয়ে বৈশাখির কাছে ফিরে আসছে রানা। খিদে পেয়েছে খুবই, তবে সাপ্লাই শেষ হয়ে আসায় পেটভরে খাওয়া হবে না। দিনের আলো থাকলে পাখি শিকার করা যেত। তবে না, সোলায়মানের এত কাছাকাছি এসে গুলি করাটা আত্মহত্যার সামিল।

এক কৌটা জেলি ছাড়া আর কিছু ছিল না, তবে আশপাশ থেকে কয়েকটা নারকেল যোগাড় করেছে বৈশাখি। খিদে লাগায় ওগুলোই অমৃত লাগল জিভে। আবার কি হয়েছে কে জানে, গম্ভীর ও নির্লিপ্ত দেখাল মেয়েটাকে। রানা কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে, তা-ও ইংরেজিতে নয়।

স্লীপিং ব্যাগে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কিন্তু বৈশাখি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকল।

সকালের নাস্তা শুধু পাকা পেঁপে। বৃষ্টি মাথায় করে এলিফ্যান্ট ট্রেইল ধরল ওরা, সেটা সোজা সৈকত পর্যন্ত চলে গেছে। আধ কিলোমিটার এগোবার পর দেখা গেল ট্রেইল ছেড়ে সরে গেছে গেরিলারা, সামনে এগিয়েছে ঝোপ-ঝাড় কেটে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, আধ কিলোমিটার পিছিয়ে এসে নিজেও জঙ্গলে ঢুকল। এদিকের বনভূমি আড়াল হিসেবে ভাল, গাছের চেয়ে ঝোপের সংখ্যা বেশি, তেমন ঘনও নয়।

পেনারেক আর মেরাঙ শহরের মাঝখানে উপকূল বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ, দুই শহরকে পাকা একটা রাস্তা এক করলেও, চোরাচালানি আর পোচারদের দখলে থাকায় সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। রাস্তাটা পার হয়ে গেরিলাদের খোঁজ পেতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল রানার।

ছোট একটা হারবার, আসলে বড় আকৃতির একটা খাঁড়ি, পিছনে এক ফালি

সরু সাদা বালি ঢাকা সৈকত। জমিনের সরু একটা আঙুল পানি পর্যন্ত প্রসারিত। আরও পিছনে জঙ্গল, আঙুলটার গায়ে গজানো গাঢ় সবুজ লোমের মত। সোলায়মানের জন্যে জায়গাটা আদর্শ। খুঁজে বের করতে তার কোন অসুবিধেও হয়নি।

আঙুল আকৃতির সৈকত থেকে পচন ধরা ও নড়বড়ে একটা জেটি পানিতে গিয়ে মিশেছে, একশো গজের মত লম্বা। ছবিটা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করে নিল রানা। খাঁড়িটা যথেষ্ট গভীর, সরাসরি ভেতরে ঢুকতে জাপানী ফ্রেইটারগুলোর কোন সমস্যাই হত না। জেটিতে ভিড়ত ওগুলো, কার্গো হিসেবে টিন ওর পাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকত। টিনের খুব জরুরী প্রয়োজন ছিল জাপানীদের, সেজন্যেই ঝুঁকি নিয়ে দিনের বেলা খাঁড়িতে ঢুকত তারা। টিন ওর ভর্তি জাহাজগুলোকে পাহারা দিত জাপানী সাবমেরিন।

খাঁড়ি থেকে সিকি মাইলটাক পশ্চিমে ঝোপের ভেতর বসে আছে রানা বৈশাখিকে পাশে নিয়ে। মেয়েটা একদম শান্ত ও স্থির হয়ে গেছে। রানার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সে। মাঝে মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা। সামনে এগোল কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে। আড়াল ভালই পাওয়া যাচ্ছে, তবে দাঁড়ানোর জন্যে নিরাপদ নয়।

মাঝে মধ্যে বিনকিউলারটা চেয়ে নিয়ে চোখে তুলছে বৈশাখি। কি দেখছে বা কি বুঝছে, সে-ই ভাল বলতে পারবে, তবে বিড়বিড় করে কখনও বলছে, 'সেনয়াং,' কখনও বলছে, 'গুড! গুড!' অনেকক্ষণ পর আবার তাকে হাসতে দেখল রানা।

বৈশাখির এই পরিবর্তন তেমন গুরুত্ব দেয়নি রানা। সোলায়মানের ক্যাম্প খুঁজে পাওয়ায় ও নিজেও খুব খুশি। এটাকে ওর ব্যক্তিগত অপারেশনই বলা যায়, সেটার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। যদিও এই মুহূর্তে কঠিনতম সমস্যার মুখোমুখি ও—এখনও জানে না কিভাবে সোলায়মানকে ধরবে। কালো কুমীর বা টেরর হিসেবে কুখ্যাত লোকটা জঙ্গলের ভেতর ক্যাম্প ফেলেছে, ক্যাম্পের ভেতর কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকেও না, তার সঙ্গীদেরও না। সেই বিকেল পর্যন্ত তাকিয়ে থাকার পর জঙ্গলের ভেতর প্রতিফলিত আলোর ক্ষীণ একটা ঝলকই শুধু ধরা পড়ল চোখে। নিরাপদ ও নিশ্ছিদ্র আড়াল নিয়েছে সোলায়মান, অতি মাত্রায় সতর্ক। কোন সন্দেহ নেই, ক্যাম্পের চারপাশে পাহারা বসিয়েছে সে, কাজেই দিনের বেলা তাকে ধরতে চেষ্টা করাটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে।

কাজ সারতে হবে রাতের অন্ধকারে। সুবিধে হলো, খোলা উপকূলে সোলায়মানও কাজে হাত দেবে ওই একই সময়ে। মাঝখানে ঝুলে পড়া জেটির ডগা থেকে আধ মাইল দূরের পানিতে ছোট ও সাদা কিছু একটা ভাসতে দেখল রানা। মার্কারই হবে। তারমানে এরইমধ্যে সাবমেরিনটাকে খুঁজে পেয়েছে সে। এখন দেখার বিষয় রাত নামলে কি করে।

দিনের আলো থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ল বৈশাখি। সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও নতুন কিছু আর রানার চোখে ধরা পড়ল না। সাগরে জলযান খুবই কম

আসা-যাওয়া করছে। জেলেদের মাছ ধরার নৌকোগুলো এত দূরে, কালো বিন্দুর মত লাগল দেখতে। ছোট একটা স্টীমার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল, তীর থেকে দু'মাইল দূর দিয়ে।

রানা চিন্তা করছে। স্কুবা ডাইভারদের সাহায্যে সোনা বা প্ল্যাটিনাম উদ্ধার করতে পারবে সোলায়মান্। কিন্তু পানির ওপর তুলতে হেভি ইকুইপমেন্ট দরকার হবে তার—বার্জ, ডেরিক, একটা হলেও ডাংকি এঞ্জিন, কোন ধরনের টেন্ডার। এ-সবের কিছুই তার কাছে নেই। কাজেই সাবমেরিনের লোকেশন সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর এখন তাকে জানতে হবে সোনা বা প্ল্যাটিনাম সত্যি সত্যি সাবমেরিনে আছে কিনা। থাকলে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না হেভি ইকুইপমেন্ট হাতে আসে।

মধ্যবর্তী সময়টা জঙ্গলের আড়ালে মরা কুকুরের অভিনয় করে যাবে সে। সেক্ষেত্রে কিভাবে তাকে ধরবে রানা?

এ-কে/ফরটিসেভেনের ব্যারেলে টেলিস্কোপ ফিট করল রানা। টেলিস্কোপটা শক্তিশালী, দূরের দৃশ্য একলাফ দিয়ে চলে এল ব্যারেলের ডগায়। দূরত্ব সিকি মাইল হলেও, সোলায়মান্‌কে দেখতে পেলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না ও। তবে করলে মাত্র একটা। কারণ তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। কাজেই সেটাকে হেড শট হতে হবে। পেটে বা বুকে গুলি করলে লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি, কিন্তু তাতে মৃত্যুর নিশ্চয়তা নেই। মাথায় লাগলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

জমিনে হাঁটু গেড়ে রাইফেল তুলল রানা, স্কোপে চোখ সেঁটে ব্যারেলটা ধীরে ধীরে একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাল। অস্পষ্ট বোট ট্র্যাক দেখতে পেল, বিনকিউলার দিয়ে আগেই বোট দুটোকে দেখেছে। পানি থেকে টেনে তুলে আনা হয়েছে জঙ্গলের ভেতর। সোলায়মান রাবার বোট ব্যবহার করছে। বালির ওপর দাগগুলো যে-ই মুছে থাকুক, কাজটা নিখুঁত হয়নি।

বোটের দাগ জঙ্গলের যেখানটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। ঝোপের খুব বেশি ভেতরে রাবার বোট রাখা হয়নি, কিন্তু তবু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। সরু সৈকতে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে একটা নারকেল গাছ, জঙ্গলের কিনারা থেকে বারো গজ দূরে। গাছটার নিচে দিয়ে রাবার বোট টেনে আনা হয়েছে, অস্পষ্ট হলেও দাগটা চেনা যাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে রানা দেখতে পেল। এক নিমেষের জন্যে স্কোপে ধরা পড়ল সে। কালো কুমীর—টেরর সোলায়মান।

রানার শত্রু একহারা। পাশার বর্ণনার সঙ্গে পুরোপুরি মিল আছে। চোখে চশমা। ছ'ফুটের মত লম্বা। কলেজ বা ভার্সিটির প্রফেসর বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। দাড়ি-গোঁফ নেই। মাথায় ফেটিগ ক্যাপ। চশমার ফ্রেমটা সরু, সম্ভবত হাড়ের তৈরি। গাঢ় সবুজ ইউনিফর্ম পরে আছে। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। এমন কি হোলস্টার বেল্টও নেই।

পাশা ওকে আরও বলেছে, সোলায়মান মদ খায় না, অন্য কোন নেশাও করে না। মেয়েরা নাকি তার দু'চোখের বিষ। আর খুনী হিসেবে খোদ আজরাইলের

চেয়ে কম নয় সে। বিশেষ করে পাইকারী হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠা তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক। হঠাৎ দৃশ্যটা রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল—বৈশাখিদের খালি গ্রামের পাশে, নালার ধারে, কুয়া থেকে ভেসে ওঠা লাশগুলো। দুর্গন্ধটা নতুন করে আঘাত করল নাকে, বমি পেল ওর।

আঙুলটা ট্রিগারেই ছিল, সেটা প্রায় টেনেও দিয়েছিল রানা। বড় করে শ্বাস টানল, ছাড়ল অর্ধেক বাতাস, ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল ট্রিগারে। তারপর সবটুকু বাতাস ছেড়ে রাইফেলটা নিচু করল। অনেক দূর হয়ে যায়। ঝুঁকিটাও বড় বেশি। তাছাড়া, এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাকে আর দেখাও যাচ্ছে না।

অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত আড়ালই থাকল ওরা। বৈশাখিকে ইতিমধ্যে একঘেয়েমিতে পেয়েছে। 'পুকাল বেরাপা?' জিজ্ঞেস করল সে। জানতে চাইছে, ক'টা বাজে?

'টিড আপা!' চুপ থাকার নির্দেশ দিল রানা। আসলে নিজের ওপর খানিকটা বিরক্ত বোধ করছে ও। গুলিটা তখন করলেই বোধহয় ভাল হত।

রাত একটু গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো জেটির গোড়ায় কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে নাইট গ্লাস নেই, কাজেই ঠিক কি ঘটছে বুঝতে পারছে না রানা। আকাশে চাঁদ থাকলেও, মেঘেরও কমতি নেই, মাঝে মধ্যেই সেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থাকার পর রানার সন্দেহ হলো, গেরিলারা শুধু শুধু জেটির ওপর আসা-যাওয়া করছে। পানিতে টর্চের আলো দেখে বোঝা গেল, রাবার বোটগুলো সাগরে নামানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলোও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু।

কি ঘটছে দেখতে হলে কাছাকাছি যেতে হবে। বৈশাখিকে রানা বলল, 'এই জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়বে না। আমি একটু ঘুরে আসি।'

বিনা প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকাল বৈশাখি। 'কিন্তু এই জায়গা খুঁজে না পেলে আমাকে আবার দোষ দেবেন না। ভাল করে দেখে যান কোথায় আমাকে রেখে যাচ্ছেন।'

একটা ঢিবির ওপর রয়েছে ওরা, ক্রল করে নিচে নামতে শুরু করল রানা। জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে, খাঁড়ির ঠিক মুখে, উঁকি দিয়ে সৈকতে তাকাল। বালির ওপর পেট ঠেকিয়ে সামনে তাকাতে হুড পরানো ল্যাম্প আর টর্চের আলো দেখতে পেল ও। পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসছে গেরিলাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, গম্ভীর গলার কমান্ড। জেটি থেকে মার্কার পর্যন্ত আসা-যাওয়া করছে রাবার বোট। বৈঠা চালাবার ছপছপ আওয়াজও ভেসে আসছে।

হুড পরানো আলোর নড়াচড়া ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট নয়। তবে বাকিটুকু কল্পনা বা অনুমান করা তেমন কঠিন নয়। অনুমানে সাহায্য করল ভারী গলার দু'একটা কমান্ড।

'ভুল যা হবার হয়েছে, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই...'

'বারবার এককথা বলছি, অথচ তোমরা কেউ কানে তুলছ না! কারও যদি মরার ইচ্ছে থাকে, দাও ডুব!'

আর কিছু শোনার বা বোঝার বাকি থাকল না রানার। স্কুবা ইকুইপমেন্ট

ঠিকই এসে পৌঁছেছে, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, ডুব দিয়ে সাবমেরিনে নামতে পারছে না ওরা। সাগরের তলায় পঞ্চান্ন বছর ধরে পড়ে থাকা একটা সাবমেরিন অনেক সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারে। হেভি ইকুইপমেন্ট না থাকায় কাজে হাত দিতে পারছে না সোলায়মান।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই—এর মানে হেভি ইকুইপমেন্ট আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।

কারও যদি মরার ইচ্ছে থাকে, সে ডুব দিতে পারে—এর মানে কি? ওদের সঙ্গে দক্ষ বা পেশাদার ডুবুরী নেই?

রানা ধারণা করল, সোনা বা প্ল্যাটিনাম যা-ই হোক, এখনও তার সন্ধান পায়নি ওরা। সাবমেরিনটা হয়তো আবিষ্কার করেছে কিন্তু জানে না ভেতরে কি আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করল ও। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। হেভি ইকুইপমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে, ভাল কথা, তাহলে ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাগরে ঘোরাফেরা করছে কেন? বিহ্বল, দিশেহারা একটা ভাব দেখা যাচ্ছে গেরিলাদের মধ্যে। কেন?

প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা, ফিরে আসছে বৈশাখির কাছে। স্কুবা ইকুইপমেন্ট থাকা সত্ত্বেও ডুব দিতে অসুবিধে কোথায়? উদ্ধার করতে না পারুক, সোনা বা প্ল্যাটিনাম যে আছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না কেন?

ঢিবির ওপর ওঠার সময় রানা সিদ্ধান্ত নিল, সোলায়মানকে খুন করার আদর্শ সময় রাতের শেষ প্রহর। ক্লান্ত গেরিলারা যখন অঘোরে ঘুমাবে। গার্ডদের পালাবদলের ঠিক আগে। সৈকতের যেখানে ছিল এতক্ষণ, ওখানেই ফিরে যাবে ও। লুকিয়ে থাকবে সামনে পড়ে থাকা কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে। তারপর অপেক্ষা করবে কখন দিনের আলো পরিষ্কার হয়। একবার হলেও জঙ্গলের কিনারা থেকে সৈকতে বেরুবে সোলায়মান। রানা টার্গেট করবে মাথাটা। একটার বেশি বুলেট খরচ করতে রাজি নয় ও।

সে-রাতে রানা কাছে টানলেও বৈশাখি সাড়া দিল না। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেক রাত জেগে থাকল ও, সোলায়মানকে খুন করার আগে ও পরে কি করতে হবে ভাবছে। প্রথম কাজ বৈশাখিকে সরিয়ে দেয়া। রাত চারটের দিকে তার ঘুম ভাঙাবে, কি ধরনের বিপদ হতে পারে ব্যাখ্যা করে তিন নম্বর হাইওয়েতে ফিরে যেতে বলবে। ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

সোলায়মানকে গুলি করা সম্ভব হলে অবস্থা বুঝে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবে রানা। গেরিলারা এখানে সব মিলিয়ে ক'জন এখনও জানা যায়নি। পঞ্চাশ থেকে একশো, তার বেশি নয়। লীডার খুন হয়ে গেছে দেখলে সবাই তারা একেকটা হিংস্র মানুষখেকো হয়ে উঠবে। সোলায়মানকে গুলি লাগা মাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হবে ছুটে পালানো। কিন্তু ভাবছে অবস্থা বুঝে দু'চার মিনিট অপেক্ষা করে দেখলে কেমন হয়। নিঃসঙ্গ একজন গার্ড বা গেরিলাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলে পালাবার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। লোকটাকে মেরে বা অজ্ঞান করে তার ইউনিফর্ম পরতে পারলে গেরিলাদের ভিড়ে মিশে যাওয়া সম্ভব। সবাই যখন আততায়ীর খোঁজে ছুটোছুটি করবে, সেই সুযোগে রেডিওর মাধ্যমে এমই-র কোটা

বারু ব্রাঞ্চে একটা মেসেজ পাঠানো যেতে পারে। গেরিলারা জঙ্গলের কিনারায় রয়েছে, খোলা সৈকতের মুখে, এখানে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার অনায়াসে ল্যান্ড করতে পারবে। সোলায়মান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রানার মন চাইছে না।

হাতঘড়িতে অ্যালার্ম সেট করল রানা, ঠিক পৌনে চারটের সময় ঘুম ভাঙাবে।

ঘুম ভাঙাল বাঘের গর্জন। আঁতকে উঠে ঝট করে বসে পড়ল রানা, হাতে রাইফেল চলে এসেছে। হার্টবিট ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল, দ্বিতীয় গর্জনটা আরও দূর থেকে আসছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো—স্লীপিং ব্যাগ সহ বসল কিভাবে ও?

ব্যাগের ভেতর বৈশাখি নেই।

প্রথমে রানা ভাবল, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে সে, এখুনি ফিরে আসবে। হাতঘড়ি দেখল। রাত মাত্র আড়াইটা। পনেরো মিনিট পরও ফিরল না বৈশাখি। ভয় পাচ্ছে, বাঘে নিয়ে যায়নি তো?

স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরুল রানা। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাতে নিল ওয়ালথার। স্লীপিং ব্যাগের ভেতর ও বাইরেটা সার্চ করল। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা ম্যাশেটি নেই।

ম্যাশেটি নিয়ে কোথায় যাবে বৈশাখি। এত রাতে জঙ্গল কাটার কি দরকার পড়ল তার?

আকাশের চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে, কাছাকাছি কোন মেঘ নেই। নার্ভাস ফিল করছে রানা। ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছে।

টর্চের মুখে হাতচাপা দিয়ে চারপাশটা দ্রুত একবার দেখে নিল রানা। আশপাশে কোথাও নেই বৈশাখি।

স্লীপিং ব্যাগে মোটা একটা গাছের ডাল আর কিছু পাতা ভরল, দেখে যাতে মনে হয় ভেতরে কেউ শুয়ে আছে। পিছু হটে ফাঁকা জায়গাটা থেকে সরে এল, বসে থাকল ঝোপের আড়ালে, রাইফেলটা রাখল হাঁটুর ওপর।

বৈশাখি জংলী না হলেও, জঙ্গলেই তার জন্ম, ছোটবেলা থেকে এখানেই সে মানুষ হয়েছে। তার ফিরে আসার শব্দ শুনতেই পেল না রানা। উপকূলের দিকে মুখ করে বসে আছে সে, ওদিক থেকেই ভৌতিক একটা ছায়ার মত হেঁটে এল। ধীর পায়ে আসছে, যতটা না সতর্ক তারচেয়ে বেশি ক্লান্ত। সোজা স্লীপিং ব্যাগটার দিকেই আসছে। এক হাতে ম্যাশেটি, অপর হাতে আরও কি যেন একটা রয়েছে। ঠিক হাতে নয়, ভাঁজ করা কনুইয়ের উল্টোদিকে। জিনিসটা যা-ই হোক, সেটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে। বৈশাখির পরনে রানার শার্ট। স্লীপিং ব্যাগের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চাঁদের আলো পড়ায় শার্টের ওপর গাঢ় দাগ দেখতে পেল রানা।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল ও। বুঝতে পারল, কিন্তু বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে মন চাইল না। কোন কোন ব্যাপার হজম করতে সময় লাগে। দেখেও

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

ঝোপের আড়াল থেকে সাবধানে বেরিয়ে এল রানা। শান্ত, নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে, বৈশাখি?'

আঁতকে উঠে ঝট করে আধ পাক ঘুরল বৈশাখি। যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি ভয় পেয়েছে। কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে, হাতের ভাঁজে আটকে রাখা জিনিসটা আরও জোরে চেপে ধরেছে স্তনের ওপর। 'পরদেশী! বৈশাখিকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন—আমি—'

হঠাৎ ঘুরে জঙ্গলের দিকে ছুটল সে। রাইফেলের বোল্ট টানল রানা। আওয়াজটা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বৈশাখি। ধীরে ধীরে আবার রানার দিকে ফিরল। ইঙ্গিতে স্লীপিং ব্যাগটা দেখাল রানা, বলল, 'এদিকে এসো, বৈশাখি।'

ব্যাগের কাছে হেঁটে এল মেয়েটা।

'ম্যাশেটিটা ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল রানা।

ফেলে দিল বৈশাখি। সাবধানে এগিয়ে এসে ঝুঁকল রানা, ম্যাশেটিটা তুলে পরীক্ষা করল। ফলায় রক্ত লেগে রয়েছে। মুখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকাল। বুকের সঙ্গে চেপে ধরা জিনিসটার দিকে হাত তুলল ও। নারকেল গাছের পাতা দিয়ে জড়ানো, তাসত্ত্বেও টপটপ করে রক্ত ঝরছে।

'ওটা নামিয়ে রাখো,' বলল রানা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল বৈশাখি, রানার নির্দেশ মানবে বলে মনে হলো না। জিনিসটা আরও শক্তভাবে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। তারপর বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঝুঁকল সে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল জিনিসটা। 'তোমার কোন ব্যাপার নয়, পরদেশী,' ফিসফিস করে বলল সে, গলা শুনে বোঝা গেল কাঁদছে।

রাগে কথা বলতে পারছে না রানা। সেই সঙ্গে অসুস্থবোধ করছে। ইশারায় সরে দাঁড়াতে বলল ও। কয়েক পা পিছিয়ে গেল বৈশাখি। এগিয়ে এসে পাতা সরিয়ে জিনিসটা দেখল রানা।

ছেলেটা সুদর্শন ছিল। বৈশাখি তার মাথাটা কাটার আগে। এই মুহূর্তে চোখ দুটো বোজা, মুখটা সামান্য চওড়া লাগছে দেখতে, চেহারায় বিস্ময়ে বোকা হয়ে যাওয়া মানুষের আড়ষ্ট হাসি।

বৈশাখি যেন পাথরের একটা মূর্তি। চুপচাপ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। চেহারায় কোন ভয় নেই। উত্তেজনাও নেই। রাস্তার পাশে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ানো সাধারণ একটা মেয়ে যেন।

'কেন, বৈশাখি?'

খালি হাতটা দিয়ে বাম স্তন স্পর্শ করল বৈশাখি, রক্তে রঞ্জিত রানার শার্টের নিচেটা যেখানে ফুলে আছে। 'ব্যথা, পরদেশী। আমাকে ব্যথা দিয়েছে ওর ভালবাসা। কতটুকু ভালবাসতাম, বুঝিয়ে বলতে পারব না। অথচ আমার সঙ্গে সে বেঈমানী করল, আমার সমস্ত আপনজনকে মেরে ফেলল। আপনি নিজের চোখে দেখেছেন, পরদেশী।'

হ্যাঁ। রানা দেখেছে।

বৈশাখি আবার তার বাম বুক স্পর্শ করল। 'আগে এখানে কষ্ট ছিল। এখন আরাম লাগছে। বৈশাখি প্রতিশোধ নিতে পেরে সুখী।'

রানার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। টর্চটা নিভিয়ে দিয়েছে আগেই। চাঁদ দিগন্তের নিচে নেমে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। বৈশাখি ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে পারে। পালালে রানা বাধা দেবে না। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, কতটুকু?

চরম একটা সংকটে পড়ে গেছে রানা। টর্চ জ্বালার ঝুঁকি নেয়া চলে না। চাঁদ ডুবে যাওয়ায় জঙ্গলের ভেতর অসহায় ও। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই এখন বাঁচার একমাত্র উপায়। কিন্তু ঠিক কি ঘটেছে না জেনে পালিয়ে যেতেও পারছে না। বিকল্প হলো, অপেক্ষা করা। বৈশাখি কারও চোখে ধরা না পড়ে ফিরে এসে থাকলে, ধড়টা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসে থাকলে এখনও সোলায়মানকে খুন করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। 'কোথায় পেলে ওকে? তুমি কি ওদের ক্যাম্পে ঢুকেছিলে?' ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, তবে রানা জানে ভূতের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে মেয়েটা।

'না। বৈশাখি ওদের ক্যাম্পে ঢোকেনি। ঢুকতাম, কিন্তু তার দরকার পড়েনি। আড়াল থেকে দেখতে পেলাম নেয়ামত গার্ড দিচ্ছে। আরও গার্ডদের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম। যতক্ষণ না একা হলো, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকলাম। তারপর কথা বললাম তার সঙ্গে।'

নেয়ামত নিশ্চয়ই ভূত দেখার মতই চমকে উঠেছিল, ভাবল রানা। কিন্তু সাবধান হয়নি কেন সে? চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকেনি কেন?

রানা কি ভাবছে বুঝতে পারল বৈশাখি। 'বৈশাখি তাকে ভালবাসার কথা বলল, পরদেশী। সে অবাক হলেও, বিশ্বাস করল—প্রেমের টানে আমি তার পিছু নিয়ে এতদূর এসেছি।'

রানা চুপ করে থাকল। কি-ই বা বলার আছে ওর। শুধু নেয়ামতকে নয়, ওকেও বোকা বানিয়েছে বৈশাখি। ব্যবহার করছে ওকে। হেসে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। ও যেমন ব্যবহার করেছে বৈশাখিকে, বৈশাখিও তেমনি ব্যবহার করছে ওকে। সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেবে, এই চিন্তাটা মাথায় ছিল বলেই রানার সঙ্গ নেয় মেয়েটা। এত কষ্ট সহ্য করার একটাই কারণ—বেঈমান প্রেমিকের মাথা কাটবে।

'এখন আমরা কি করব, পরদেশী? আপনি কি বৈশাখিকে শাস্তি দেবেন? পুলিসের হাতে তুলে দেবেন, তারা যাতে বৈশাখিকে ফাঁসিতে ঝোলায়?'

'ও-সব ভুলে আমার কথার জবাব দাও,' রুক্ষস্বরে বলল রানা। 'ঠিক জানো, কেউ তোমাকে দেখেনি বা কিছু শুনতে পায়নি?'

'মনে হয় না। কাজটা আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরেছি। এক কোপে। মাথাটা আলাদা হতেই পাতায় জড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

চাঁদ ডুবে যাওয়ায় ভাগ্যকে তিরস্কার করল রানা। অন্ধকার এখন ঘন আলকাতরার মত। এই জায়গায় ওকে যেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মাথার ভেতর বিপদসংকেত বাজছে, অথচ করণীয় স্থির করতে পারছে না। 'মাথাটা নিয়ে পালিয়ে এলে, কিন্তু ধড়টা? ওটা লুকিয়ে রেখে এলে না কেন?'

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল বৈশাখি।

'ভোরের আলো ফুটলেই লাশটা ওরা দেখতে পাবে,' বলল রানা। 'তার আগেও দেখে ফেলতে পারে। তখন কি ঘটবে, কল্পনা করতে পারো? বুঝতে পারছ, আমাকে তুমি কি ধরনের বিপদে ফেলে দিয়েছ?'

নিজেকে বোকা বলে তিরস্কার করল রানা। বৈশাখির গোপন উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারা উচিত ছিল ওর। হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর আর নির্লিপ্ত হয়ে ওঠা দেখেই বুঝে নেয়া উচিত ছিল কি চলছে তার মাথার ভেতর। এখন অবশ্য এ-সব ভেবে কোন লাভ নেই। পুরো প্ল্যানটাই এখন বদলে ফেলতে হবে।

বৈশাখি ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, পরদেশী। মস্ত ভুল করে এসেছি। সত্যি, আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে বৈশাখি জানত না আপনি কি করতে চান।'

এ হলো গোটা ব্যাপারটা চেপে রাখার ফল। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল রানা, ওর প্ল্যান বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে বৈশাখির কোন ধারণাই নেই। এক অর্থে যা ঘটেছে তার জন্যে ও নিজেই দায়ী। ও যদি সব কথা খুলে বলত বৈশাখিকে…

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল—পালাও! এখুনি! এমন কি টর্চ জ্বালতে হলেও জ্বালো।

অন্ধকারে নড়ে উঠল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কখনও ভুল করে না। এবারও করেনি। তবে দেরি করে ফেলেছে।

প্রায় একযোগে চোখ-ধাঁধানো চারটে আলোর টানেল তৈরি হলো, ওদের দিকে তাক করা। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলে উঠল এক লোক। 'মাথার ওপর হাত তুলুন। নড়বেন না।'

বলে দিতে হলো না, গলার আওয়াজটা কার রানা আন্দাজ করতে পারছে।

পাঁচ

ঘটনাটা ওরা রানাকে দেখতে বাধ্য করল।

প্রথমে ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্ক করল দাতো সোলায়মানের লেফটেন্যান্টরা। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড লোকটা থাই, নাম থিউ ডেবাঙ, লেফটেন্যান্টদের মুখপাত্র হয়ে সোলায়মানের কাছে সুপারিশ নিয়ে এল, মেয়েটাকে যেন বাঁচিয়ে রাখা হয়।

থিউ ডেবাঙ সোলায়মানকে শ্রদ্ধা করে, তবে ভয় পায় না। কখনও ইংরেজি, কখনও মালয়ী, আবার কখনও থাই ভাষায় কথা হলো। ডেবাঙের গলা শান্তই থাকল, কিন্তু সোলায়মানের গলা ক্রমশ চড়ছে। রানাকে ওরা গ্রাহ্য করছে না। করার দরকারও নেই। বৈশাখির পরই ওর পালা।

ডেবাঙের যুক্তি, প্রায় ছ'মাস হলো থাই সীমান্ত পেরিয়ে মালয়েশিয়ায় ঢুকেছে গেরিলারা, এই ছ'মাস কেউ তারা কোন নারীর সঙ্গ লাভ করেনি। না-না, লেফটেন্যান্টরা শর্ত আর নিয়মের কথা ভুলে যায়নি—অপারেশনে থাকার সময় মেয়েদের সংসর্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে থাকতে হবে। এই নিয়ম সাধারণ গেরিলাদের জন্যে ঠিক আছে, কিন্তু লেফটেন্যান্টদের জন্যে শিথিল করা যেতে পারে, বিশেষ করে না চাইতেই যখন অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে তাদের মাঝখানে এসে পড়েছে।

সোলায়মান তার ফিল্ড ডেস্কের পিছনে বসে আছে, ফর্সা ও পরিচ্ছন্ন হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল সে। 'না। আমার ক্যাম্পে কোন মেয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ছ'মাস মেয়ে ছাড়া যখন চলতে পেরেছে, আরও ছ'মাস সেভাবেই কাটাবে সবাই। তাছাড়া, সাধারণ গেরিলা আর লেফটেন্যান্টদের জন্যে আলাদা নিয়ম চলতে পারে না। ডেবাঙ, আমি যে নির্দেশ দিয়েছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।'

পিরামিড আকৃতির তাঁবুর এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে রানাকে। এটাই কালো কুমীর দাতো সোলায়মানের হেডকোয়ার্টার। হাত দুটো পিছমোড়া করে আর গোড়ালি দুটো এক করে নাইলন রশি দিয়ে বাঁধা। কি ঘটছে শোনা ও দেখা ছাড়া কিছুই ওর করার নেই। এখন পর্যন্ত ওর প্রতি কোন মনোযোগ দেয়নি গেরিলারা।

ডেবাঙ সবিনয়ে নিবেদন করার ভঙ্গিতে বলল, বস্ যদি চান যে লেফটেন্যান্টরা নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকবে, সেক্ষেত্রে তাদের কিছু বলার নেই আর। কিন্তু মেয়েটাকে অন্য কারণেও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। তাকে দিয়ে কাপড় ধোয়ানো আর রান্নাবান্নার কাজ করানো যায়।

সোলায়মান আবার মাথা নাড়ল। 'এ-সব চালাকিতে কোন কাজ হবে না, ডেবাঙ। লেফটেন্যান্টদের পরিষ্কার জানিয়ে দাও, অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আশ্চর্য, তোমরা ভুলে যাচ্ছ কিভাবে ও আমাদের একজন গার্ডকে খুন করেছে! তোমার আচরণ আমাকে বিস্মিত করছে, ডেবাঙ।'

'আমি বাধ্য হয়ে আপনার কাছে এসেছি, স্যার,' বলল ডেবাঙ। 'লেফটেন্যান্টদের ভাবগতিক সুবিধের মনে হয়নি আমার। মেয়েটাকে এত তাড়াতাড়ি মেরে ফেলা হোক, এটা একদমই চাইছে না তারা। স্যার, এক কাজ করলে হয় না?'

কথা না বলে চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল সোলায়মান।

'সব মিলিয়ে বিশজন লেফটেন্যান্ট। ওরা পাঁচ-সাতদিন নিজেদের কাছে রাখুক মেয়েটাকে, তারপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক?'

সোলায়মানের গলা গমগম করে উঠল, 'ডেবাঙ, তুমি মনে হচ্ছে আমাকে ভয় পাও না!'

শান্তস্বরে, কিন্তু সাহসের সঙ্গে, ডেবাঙ জবাব দিল, 'বস্, কেউ যদি কাউকে ভয় পায়, তাকে আসলে অসম্মান করা হয়। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

হঠাৎ সাপ যেভাবে ফণা তোলে, এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়ল সোলায়মান। 'আর একটা কথাও নয়, ডেবাঙ! এই প্রসঙ্গের এখানেই ইতি। এ নিয়ে তুমি বা অন্য কেউ যদি আর একটা কথাও বলে, তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব।'

ঢোক গিলল ডেবাঙ, হাঁ করল, সাহস হারিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

তাঁবুটা গাঢ় সবুজ রঙের, লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো বাইরে বেরুচ্ছে না। রানার ওয়ালথারটা ডেস্কে পড়ে রয়েছে, হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল সোলায়মান। নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিল, হাতে নিল স্টিলেটোটা। এ-কে/ফরটিসেভেনটা কোথায়, কার কাছে আছে রানা জানে না।

ঘাড় সামান্য ফিরিয়ে এতক্ষণে রানার দিকে ফিরল সোলায়মান। চশমার ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, কথা বলছে না।

'রহস্যটা কি?' রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'মালয়েশিয়ান সেনাবাহিনী তোমার নাগাল পায় না কেন? আমি তো পেলাম।'

রানা থামতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল সোলায়মান। তারপর বলল, 'আপনি আমার নাগাল পাননি, মি. রানা। বিশ্বাস করুন, আমরা আপনাকে কাছাকাছি আসতে দিয়েছি।'

'তারমানে?'

'মানে খুব সহজ। আপনি আসছেন, এ-খবর অনেক আগেই পৌঁছে গেছে আমার কাছে। কেউ একজন চেয়েছেন আমাদের হাতে ধরা পড়েন আপনি। তিনি আপনার পুরানো একজন শত্রু। নিজে পারেননি, আমাকে দিয়ে আপনাকে খুন করাতে চেয়েছেন।'

রানা বিমূঢ়। এমই-র পাশাকে ও বলেছিল, ওদের ইন্টেলিজেন্সে একজন বেঈমান আছে। পাশা ওর সঙ্গে একমত হয়েছিল। কিন্তু কে সে বেঈমান, এখনও রানা জানে না। সে যে-ই হোক, রানার সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই, ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর সিআইএ কর্মকর্তার কথা ভাবল রানা। থাইল্যান্ডে বসে যে লোক সোলায়মানকে সাহায্য করছে। কে সে, নাম কি? আন্তর্জাতিক এসপিওনাজ জগতে ওর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত এমন কর্মকর্তার অভাব নেই সিআইএ-তে। কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতাও যে নেই, তা নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কার এত আক্রোশ যে···

মাথা নাড়ল রানা। 'মেনে নিতে পারছি না। মালয়েশিয়ান ইন্টেলিজেন্সে তোমার একজন লোক থাকলেও, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই।' প্রসঙ্গটা তুলে বেঈমান লোকটার পরিচয় জানতে চাইছে রানা।

'না-না, আমি সাকার আবদুল্লার কথা বলছি না,' হেসে উঠে বলল সোলায়মান। 'তার সঙ্গে তো আপনার পরিচয়ই নেই। তবে আপনি যে আসছেন, এই খবরটা তার কাছ থেকেই পান আরেক ভদ্রলোক।'

'যে জীপ নিয়ে কোটা বারু থেকে তোমার সঙ্গে জঙ্গলে দেখা করতে এসেছিল? রেডিওর পার্টস আর সাপ্লাই দিয়ে গেছে তোমাকে?'

'কোটা বারু থেকে নয়, থাইল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ভদ্রলোক,' বলল সোলায়মান। 'যে আপনার মৃত্যু কামনা করে, নাম বললে নিশ্চয়ই তাকে আপনি চিনতে পারবেন। আসলে, সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা ভুলে আপনার কপাল ফেটেছে, মি. রানা।'

'বুঝলাম না।'

'জাপানী সাবমেরিনটা কোথায় ডুবেছে জানার পর আমি একজন লোক পাঠাই কোটা বারুতে–রসদ, অস্ত্র, রেডিওর পার্টস আর স্কুবা ইকুইপমেন্টের একটা তালিকা সহ। ভুলটা হলো, তালিকায় ডাইভারের কথা লিখিনি। আমার লোক কোটা বারুতে পৌঁছে সাকার আবদুল্লাকে তালিকাটা দেয়। আবদুল্লা সেটা পাঠিয়ে দেয় থাই সীমান্তে, সিআইএ-র একজন কর্মকর্তার কাছে। তালিকার সঙ্গে একটা মেসেজও পাঠায় সে, তাতে আপনার পরিচয় দিয়ে বলা হয়, আপনি একাই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রওনা হয়েছেন। আবু রাশেদ মারা যাওয়ায় আপনি নাকি আমার ওপর গোস্যা হয়েছেন।' আবার হেসে উঠল সোলায়মান।

রানা উপলব্ধি করল, লোকটা সত্যি কথাই বলছে।

'থাই সীমান্ত থেকে উনি নিজেই এলেন–সিআইএ অফিসারের কথা বলছি। তাঁর সঙ্গে ড্রাইভার নেই দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুষড়ে পড়ি আমি। সত্তর ফুট পানির নিচে রয়েছে সাবমেরিন, ডাইভার ছাড়া অত নিচে ডুব দেবে কে? আগে তো জানতে হবে সাবমেরিনে সোনা আছে কিনা, তারপর না উদ্ধার করার প্রশ্ন। আমি নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছি, এই সময় অফিসার ভদ্রলোক আমাকে আশ্বস্ত করলেন। আপনার পরিচয়, খ্যাতি, বীরত্ব, আমার ওপর আক্রোশের কারণ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। তারপর জানালেন, আপনি খুবই দক্ষ একজন ডাইভার।'

'জানতেই যদি আমি আসছি, পথে খুন হবার জন্যে স্কাউট আর গার্ড রাখলে কেন?'

'স্বার্থ উদ্ধার করতে হলে কিছু লোকসান মেনে নিতে হয়,' শান্তসুরে বলল সোলায়মান। 'উপকূল পর্যন্ত আসার পথে আমার কোন লোকজনকে যদি না দেখতেন, আপনার মনে সন্দেহ জাগত না? অফিসার ভদ্রলোক আমাকে এ-ব্যাপারেও আশ্বস্ত করে গেছেন: পথে দু'পাঁচজন লোক থাকলেও আপনাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, ঠিকই আপনি আমার নাগাল পেয়ে যাবেন। ঘটেছেও তাই। সত্যি, আপনার প্রশংসা করতে হয়, মি. রানা।'

'আমাকে তুমি সাবমেরিনে নামাতে চাও,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি যদি রাজি না হই? যদি কোন শর্ত দিই?'

'শিয়াল যতই চতুর হোক, ফাঁদে আটকা পড়ার পর তার কি শর্ত দেয়ার সুযোগ থাকে?'

'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও, সোলায়মান,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'তা না হলে আমি কোন সাহায্য করব না।'

'পাহাড়ী, জংলী একটা মেয়ের জন্যে এত কেন দরদ আপনার?'

সোলায়মানকে বিস্মিত দেখাল। 'তার জন্যেই তো সময়ের আগে ধরা পড়ে গেলেন।'

'নিরীহ একটা মেয়েকে কেন তুমি খুন করবে? সে তো কোন অপরাধ করেনি,' এমন সুরে কথা বলছে রানা, সোলায়মানের কথা যেন শুনতে পায়নি। 'ও স্রেফ বেঈমানীর প্রতিশোধ নিয়েছে। তাছাড়া, ওকে ছেড়ে দিলে তোমার কোন ক্ষতি হবারও আশঙ্কা নেই।'

'আপনার এই দিকটা সম্পর্কে অফিসার ভদ্রলোক আমাকে কিছু বলে যাননি,' ছুরিটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করছে সোলায়মান। 'এত নরম মন নিয়ে এই প্রফেশনে এতকাল টিকে আছেন কিভাবে?'

'আমি স্যাডিস্ট নই, সোলায়মান। একান্ত প্রয়োজন না হলে খুন করি না।'

'আমি করি, মি. রানা। আমি সত্যি একজন স্যাডিস্টও। কারণটা নাই-বা শুনলেন, শুধু ঘটনাটা বলি—বাবা আমার সামনে মাকে খুন করে। মা'র অপরাধ ক্ষমা করার মত ছিল না, তাই ওই কাজে বাবাকে আমি সাহায্যও করি।'

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রানা।

'দুঃখিত, মি. রানা। আপনার বৈশাখিকে মরতেই হবে। কাল সকালে জবাই করা হবে তাকে।'

কথা না বলে চোখ বুজল রানা। 'তুমি একটা শুয়োরের বাচ্চা, সোলায়মান।'

ডেস্ক ছেড়ে রানার দিকে হেঁটে আসছে সোলায়মান। আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলল রানা। পলকের জন্যে শুধু ফিল্ড বুটটা দেখতে পেল, সরাসরি মুখে এসে লাগল সেটা।

সারারাত একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল রানাকে। একের পর এক বুটের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও, টেনে-হিঁচড়ে কখন তাঁবু থেকে বের করে আনা হয়েছে জানতেও পারেনি।

হাত-পা আর মুখ মশার কামড়ে ফুলে উঠেছে, চুলকানি আর জ্বালা অনুভব করল ভোর রাতের দিকে জ্ঞান ফেরার পর। হাত-পা আর গলায় জোঁক রয়েছে, রক্ত খেয়ে ঢোল। নাইলনের রশি গাছ থেকে খুলে দু'জন লোক টানছে, বধ্যভূমিতে নিয়ে আসছে ওকে। বৈশাখির মৃত্যুদণ্ড চাক্ষুষ করানো হবে।

প্রচণ্ড ব্যথায় মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে, মুখ আর নাকের ভেতর জমাট বেঁধে আছে রক্ত। নিজের এতসব কষ্ট গ্রাহ্য করছে না রানা। বৈশাখির জন্যে কিছু করতে পারবে না বুঝতে পেরে এত অসহায়বোধ করছে, মনে হচ্ছে এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল।

তবু ভাল যে আয়োজনটা দ্রুত সেরে ফেলল ওরা। নতুন ইউনিফর্ম পরেছে সোলায়মান, বুকে পদক ঝুলছে কয়েকটা, দু'কাঁধে একজোড়া করে স্টার। গেরিলারা সবাই উপস্থিত, শুধু গার্ডরা বাদে। সব মিলিয়ে ছিয়ানব্বুই, গুনল রানা। কয়েকজনকে গম্ভীর ও অসন্তুষ্ট দেখালেও, বাকি সবাই নির্লিপ্ত। গম্ভীর কয়েকজন নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। হাত ও পা বাঁধা বৈশাখিকে নিয়ে আসা হলো, রানার মতই টানতে টানতে। বড় একটা ধরাশায়ী টিক লগ-এর দিকে আনা হচ্ছে

তাকে।

বৈশাখির গায়ের শার্ট খুলে নেয়া হয়েছে। রানাকে মাত্র দু'জন লোক টেনে এনেছে, কিন্তু বৈশাখিকে টেনে আনছে পাঁচ-ছয়জন। মাটিতে শোয়া অবস্থাতেও নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করছে মেয়েটা। কাঁদছে সে, অভিশাপ দিচ্ছে, গেরিলাদের হাত-পায়ে কামড় দেয়ার চেষ্টা করছে। তার ছেঁড়া সারঙটাও নেই কোমরে। রানাকে হঠাৎই দেখতে পেল সে, অমনি চিৎকার করে বলল, 'পরদেশী! পরদেশী! ওদেরকে থামান আপনি! বৈশাখিকে বাঁচান!'

মিরাকলে রানার বিশ্বাস নেই। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ওর সব প্রার্থনাও পূরণ হয় না। তবে আজ রানা, হয়তো বোকার মতই, সৃষ্টিকর্তাকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকল, আগে সম্ভবত এভাবে কখনও ডাকেনি। বৈশাখি ওর কেউ নয়। ক'দিনেরই বা পরিচয়। কিন্তু মেয়েটার সারল্য আর প্রাণচাঞ্চল্য মুগ্ধ করেছে ওকে। অনেক প্রিয়জনকে চোখের সামনে খুন হয়ে যেতে দেখেছে ও, সে-সব ঘটনা মনে পড়লে এখনও বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয় হৃদয়টা। সে-সব ঘটনা চাক্ষুষ করার সময়ও প্রার্থনা করেছে রানা। তবে সে-সব প্রার্থনায় কখনোই এই কথাগুলো ছিল না—'হে আল্লাহ, মেয়েটাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো, এমন কি আমার মৃত্যুর বদলে হলেও!'

'পরদেশী! বৈশাখি তোমার পায়ে মাথা ঠুকছে। ও আল্লাহ!'

রানার পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে। সোলায়মানের দিকে তাকাল ও। মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। রাগে ও ঘৃণায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে রানা। নাইলনের রশি হাত-পায়ের মাংসে ডেবে যাচ্ছে, তবু এতটুকু ঢিলে হচ্ছে না গিঁটগুলো। বাঁধনগুলো খোলা সম্ভব নয়। খুলতে পারলেও যে কোন লাভ হবে, তা নয়। চারজন গার্ড ঘিরে রেখেছে ওকে, সবার রাইফেল ওর দিকে তাক করা।

পরিস্থিতিটা এতক্ষণে বুঝতে পারল বৈশাখি। উপলব্ধি করল, রানা কিছুই করতে পারবে না, ব্যাপারটা সত্যি সত্যি ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সে। গার্ডরা টিক লগ-এর সামনে বসাল তাকে, তারপর হাঁটুর ওপর খাড়া করল। তাদের একজন চুলের গোছা ধরে মাথাটা টেনে নামিয়ে দিল লগের ওপর। বৈশাখির ঘাড় ও গলা এত সরু, আগে খেয়াল করেনি রানা।

মাথাটা অনেক কষ্টে সামান্য একটু ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাতে পারল বৈশাখি। তার চোখে জল।

সবুজাভ রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল ম্যাশেটির ফলা, নেমে এল স্যাঁৎ করে। থ্যাচ্ করে একটা শব্দ হলো। লগের এক পাশে ছিটকে পড়ল মাথাটা, রেশমের মত একরাশ চুল ছিটকে বেরিয়ে আসা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। লগ থেকে খসে পড়ল মুণ্ডহীন শরীর, বারকয়েক ঝাঁকি ও মোচড় খেলো।

রানা চোখ বুজল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সোলায়মান নির্দেশ দিল, 'মাটি চাপা দাও।' ঘুরে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেল সে।

গার্ডরা টান দিয়ে দাঁড় করাল রানাকে, হাঁটিয়ে নিয়ে এল পাতায় ছাওয়া

একটা ঘরে।

সারাদিন শুকনো পাতার দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল রানা। দু'বার বৃষ্টি হলো, ওই বৃষ্টির পানি ছাড়া পেটে দেয়ার মত কিছু পাওয়া গেল না। খাবার তো দিলই না, এমন কি ঘরের ভেতর ঢুকলও না কেউ।

দু'জন গার্ড বিরতিহীন চক্কর দিচ্ছে ঘরটাকে ঘিরে। নিজেদের মধ্যেও কথা বলছে না তারা। কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে আন্দাজ করা কঠিন নয়। রানা পালিয়ে গেলে দু'জনকেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে।

গেরিলাদের মধ্যে ডাইভার নেই, তাই ওকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। দিনের আলোয় জঙ্গল থেকে গেরিলারা কেউ বেরুচ্ছে না। রাবার বোট দুটো আবার টেনে আনা হয়েছে জঙ্গলের ভেতর। সৈকতে কেউ নেই, ভাঙাচোরা জেটিটাও খালি পড়ে আছে। রানা জানে, সন্ধের দিকে সাগরে নামতে বলা হবে ওকে। জঙ্গলের ভেতর গেরিলারা বাঁশ কেটে ভেলা তৈরির কাজে ব্যস্ত। রানা পানির নিচে ডুব দেয়ার পর ভেলা আর রাবার বোট নিয়ে পাহারা দেবে গেরিলারা, ও যাতে পালাতে না পারে।

সাবমেরিনে রানা সোনা অথবা প্ল্যাটিনাম পাক বা না পাক, বটলের অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবার আগেই পানির ওপর ভেসে উঠতে হবে ওকে। তারপর ওকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

ছয়

সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পর এল ওরা। সোলায়মানের হাতে কোন অস্ত্র নেই, শুধু হুড পরানো একটা টর্চ। বাকি চারজন সশস্ত্র, সঙ্গে টর্চও আছে।

গার্ডরা রানার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে, রানার চোখে চোখ রেখে সোলায়মান বলল, 'মার্কারটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, মি. রানা? আমাদের কাছে আন্ডারওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা আছে, রশি দিয়ে বেঁধে সেটা রাবার বোট থেকে পানির তলায় নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। সাবমেরিনটা আমরা পেয়েছি, কিন্তু ডাইভার না থাকায় ওটার কাছে পৌঁছুতে পারা যায়নি। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খোলাই আছে, কিন্তু সাবমেরিনটা কাত হয়ে শুয়ে থাকায় ভেতরে ক্যামেরা ঢোকানো যায়নি। ফলে মনিটরে আমরা কোন সোনা দেখতে পাইনি। তা না পেলেও, সোনা যে আছে এ-ব্যাপারে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর। আপনার কাজ ভেতরে ঢুকে ওই সোনা খুঁজে বের করা।'

– 'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনাকে রাবার বোট থেকে মার্কারের কাছে নামিয়ে দেয়া হবে। ফিন, মাস্ক, অক্সিজেন বটল, সবই থাকবে আপনার সঙ্গে। একটা আন্ডারওয়াটার টর্চও থাকবে। নিচে নেমে সাবমেরিন সার্চ করে ফিরে আসতে খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা

লাগবে আপনার, বটলে অক্সিজেনও থাকবে ওই আধ ঘন্টা কাজ চলার মত।'

'ডাইভিং সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না,' বলল রানা। 'ওঠার সময় ডিকমপ্রেশনের জন্যে কয়েকবার থামতে হবে আমাকে, তাতেই সময় লাগবে আধঘন্টা। নেমেই উঠে আসতে হবে, সাবমেরিনে ঢুকে সার্চ করব কখন?' ডিকমপ্রেশনের সময়টা ইচ্ছে করেই খানিকটা বাড়িয়ে বলছে ও।

'সেক্ষেত্রে অক্সিজেন দেয়া হবে এক ঘন্টা চলার মত,' বলল সোলায়মান। 'তবে আরও একটা কথা বলে রাখি, তা না হলে আপনার মাথায় পালানোর ভূত চাপতে পারে। আপনার সঙ্গে আমরা কেউ নামতে পারছি না, তাই ভিডিও ক্যামেরা থাকবে ওখানে–রাবার বোট থেকে রশির সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। জঙ্গলে বসে মনিটরে আমরা সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের খোলা হ্যাচ দেখতে পাব।'

মনে মনে হাসল রানা। রশির শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত ক্যামেরা স্থির থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভাগ্য সহায়তা করলে ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দিয়ে হ্যাচ গলে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসা কোন সমস্যা হবে না।

'ভেলাগুলো তো দেখেছেনই, তাই না? দশটা ভেলায় ত্রিশজন লোক থাকবে–কাছে, দূরে। সাবমেরিন থেকে যত দূরেই আপনি ভেসে উঠুন, ওরা আপনাকে ঠিকই দেখতে পাবে। আমি বলতে চাইছি, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম করতে যাবেন না–সোজা মার্কারের পাশে ভেসে ওঠাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'উঠলাম,' বলল রানা। 'তারপর?'

'অর্থাৎ আপনি জানতে চাইছেন, আপনাকে নিয়ে কি করব আমরা।' সোলায়মান গম্ভীর, 'না, মি. রানা। মিথ্যে আশ্বাস দেয়ার লোক আমি নই। সিআইএ-র ওই ভদ্রলোক আমার বন্ধু মানুষ, তাঁকে আমি কথা দিয়েছি।'

মরতেই যখন হবে, তোমাকে আমি সাহায্য করব কেন? এই প্রশ্নের জবাব কি দেয়া হবে জানে রানা, তাই আর প্রশ্নটা উচ্চারণ করল না। সোলায়মান নিশ্চয়ই কোটা বারু থেকে ডাইভার আনাবার ব্যবস্থা করেছে, তাদের পৌঁছুতে দু'এক হপ্তা দেরি হবে, এই যা। রানা সাবমেরিনে নামতে অস্বীকার করলে এখানে, এখুনি ওকে গুলি করা হবে, কিংবা বৈশাখির মত জবাই। 'কে সে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আমাকে যখন মেরেই ফেলবে, পরিচয়টা জানাতে ভয় পাচ্ছ কেন?'

'কে বলল ভয় পাচ্ছি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোলায়মান। নাম-পরিচয় বলিনি, অপেক্ষা করে দেখছিলাম আপনি নিজেই তাঁকে চিনতে পারেন কিনা। অ্যালান বোর্ডার–এশিয়া জোন-এর ডিরেক্টর। আপনার ওপর তাঁর রাগের কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। ইরান ও ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট সম্পর্কে বিসিআই নাকি অনেক তথ্য জানে, সে-সব তথ্য বোর্ডার সাহেব আপনার কাছে চেয়েছিলেন। আপনি দেননি।'

ঘটনাটা অনেক বছর আগের, প্রায় ভুলেই গিয়েছিল রানা। অ্যালান বোর্ডার তখন ফিল্ড অপারেটর ছিল। কিন্তু বোর্ডার নয়, তথ্যগুলো ওর কাছে চেয়েছিল বোর্ডারের স্ত্রী এলিনা। ও-সব তথ্য বিসিআই-এর কাছে নেই, রানার এই জবাব

এলিনা বিশ্বাস করেনি। রানার সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা করে সে, এমন কি মোটা টাকা ঘুষও সাধে। বাধ্য হয়েই এলিনাকে কিছু কড়া কথা শোনাতে হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমার আরও একটা প্রশ্নের জবাব তুমি এড়িয়ে গেছ—কেন?'

'কি প্রশ্ন?'

'সেনাবাহিনী তোমার নাগাল পায় না কেন? রহস্যটা কি?'

'রহস্যটা সাকার আবদুল্লা,' হাসতে হাসতে বলল সোলায়মান। 'ইন্টেলিজেন্স আর সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই তো লিয়াজোঁ অফিসারের দায়িত্ব পালন করে। সেনাবাহিনী কখন কোথায় আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে, সে-সব খবর তার মাধ্যমে আগেই পেয়ে যাই আমরা। ভেবে দেখুন, অ্যামবুশ পাততে কত সুবিধে হয় আমাদের।'

'আবদুল্লা...'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর কোন প্রশ্ন নয়।' গার্ডদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সোলায়মান।

সৈকতে নিয়ে এসে গার্ডরা রানাকে ফিন, মাস্ক, স্কুবা ট্যাংক পরাল। কোমরে জড়াল টুল বেল্ট, আন্ডারওয়াটার লাইটটা ওটার সঙ্গে আটকে দিল। ওকে নিয়ে রাবার বোটে উঠল তারা। দশটা ভেলা এরইমধ্যে মার্কারের চারপাশে বেশ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, বৃত্তাকারে। রাবারের দ্বিতীয় বোটটা রয়েছে মার্কারের পাশে। রানা আন্দাজ করল, ভিডিও ক্যামেরাটা আগেই সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের কাছাকাছি নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

বোটে সবার শেষে উঠল সোলায়মান। দু'জন গার্ড বৈঠা চালাচ্ছে, বাকি দু'জন মুহূর্তের জন্যেও রানার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না, হাতের রাইফেল মাথা আর বুকের দিকে তাক করা। বোটে ওঠার পর এখন সোলায়মানের হাতেও রানার ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে।

'সোনার গল্পটা তোমার কাছে অবাস্তব মনে হয়নি?'

উত্তর দেয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোলায়মান। 'আপনার প্রশংসা করতে হয়, মি. রানা। নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এতটুকু বিচলিত নন।'

'তোমার ফেলা জালে আটকে গেছি, সেটা ছিঁড়ে বেরুতে পারব না,' বলল রানা। 'এটা বাস্তব সত্য, কাজেই মেনে নিয়েছি।'

'কিন্তু বোর্ডার সাহেব আমাকে উল্টো কথা বলে গেছেন। পরাজয় স্বীকার বা হাল ছাড়ার পাত্রই নাকি নন আপনি।' সাগরের চারদিকে চোখ বুলাল সোলায়মান। 'তবে এ-ও ঠিক যে আমার এই জাল ছিঁড়ে সত্যি আপনি বেরুতে পারবেন না।' একটু থেমে সোনার প্রসঙ্গটা তুলল সে, 'নেয়ামতের মুখে শুনে স্রেফ গল্পই মনে হয়েছিল। কিন্তু বৈশাখির দাদুকে টরচার করার পর ব্যাপারটা বিশ্বাস্য মনে হলো। অন্তত, বুড়ো যে মিথ্যে কথা বলেনি, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সে নিজের চোখে জাপানীদেরকে মন্দিরটা লুঠ করতে দেখেছে, তারপর পিছু নিয়ে এই জায়গায় আসে। চারটে সোনার সাপ কাঁধে করে বয়ে আনে জাপানীরা।

সাবমেরিনেও তোলে। যে-কোন কারণেই হোক, তিনদিন ভেসে ছিল ওটা, ডুব দেয়নি। তারপর একটা অস্ট্রেলিয়ান প্লেন আসে, বোমা ফেলে ডুবিয়ে দেয় ওটাকে।

'পরে প্লেনটা আবার ফিরে এসে জাপানীদের কয়েকটা টিন শিপও ডুবিয়ে দেয়। জঙ্গলের কিনারায় বসে সবই দেখে বুড়ো। একটা ম্যাপও আঁকে। কিন্তু ঘটনাটা কাউকে কোনদিন বলেনি। এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে আমার। ম্যাপটা বুড়ো পরে পুড়িয়ে ফেলে। ব্যাটা নিশ্চয়ই কাপুরুষ ছিল, তা না হলে হঠাৎ যুদ্ধ ছেড়ে পালাবে কেন। সে যাই হোক, অত্যধিক বয়েস হওয়ায় ঘটনাটা সে ভুলে যায়। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখলে বলে ফেলত। সেটাই তার কাল হয়।'

'শুধু বৈশাখির দাদু নয়, আরও কেউ সাবমেরিনটাকে ডুবে যেতে দেখে থাকতে পারে,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে হয়তো অনেক আগেই ডুবুরী নামিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তোমার সোনা।'

খোঁচাটা নীরবেই হজম করল সোলায়মান।

ইতিমধ্যে জেটির শেষ মাথা ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা দূরে সরে এসেছে বোট। সাদা মার্কার-এর পাশে দ্বিতীয় বোটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। ওটায় ছ'জন লোক রয়েছে, সবাই সশস্ত্র।

বোট দুটো পাশাপাশি হলো। সোলায়মানকে বলতে হলো না, রানা নিজেই বোট থেকে পানিতে নামল। ওর দিকে ঝুঁকল সে, বলল, 'সাবমেরিনটা একটা প্রবাল পাহাড়ের কার্নিশে পড়ে আছে। কাত হয়ে। খোলা হ্যাচের সামনে ঝুলছে ক্যামেরা, মনিটরে আপনাকে আমরা ঢুকতে ও বেরুতে দেখব। দ্বিতীয় বোটটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। রঙিন প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে টিভি-মনিটর। হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'মি. রানা, শেষ মুহূর্তে আপনাকে একটা সুখবর দিই। আমি নিশ্চিত, খবরটা আপনার কানে মধুবর্ষণ করবে।' পরিবেশে নাটকীয়তা আনার জন্যে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'বোর্ডার সাহেব একটা শর্ত দিয়ে গেছেন।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

'তাঁর শর্ত পূরণ করলে আপনি বেঁচে যাবেন,' বলল সোলায়মান।

'কি শর্ত?'

'ইরাকী নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট সম্পর্কে সিআইএ-র এখন আর কোন আগ্রহ নেই। ওরা ইরানী প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চায়। আপনাকে ছাড়া হবে না, থাই সীমান্তে আটকে রাখা হবে, যেভাবেই হোক ওখানে বসে বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে ফাইলটা আনিয়ে বোর্ডার সাহেবের হাতে তুলে দেবেন আপনি।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে, আসলে অভিনয় করছে। বোর্ডার এ-ধরনের কোন শর্ত দিয়ে গেছে, এটাই ও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাছাড়া, ইরানের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট সম্পর্কে বিসিআই যতটুকু জানে, সিআইএ-র তার চেয়ে বেশি জানার কথা।

সোলায়মান আসলে ভয় পাচ্ছে, ও পালাতে চেষ্টা করবে। সেজন্যেই মিথ্যে

আশ্বাস দিচ্ছে ওকে।

'ঠিক আছে, সাবমেরিন থেকে উঠে এসে সিদ্ধান্ত নেব,' বলল রানা।

'ওটার কাছে পৌঁছুতে ক'মিনিট লাগবে আপনার?' জিজ্ঞেস করল সোলায়মান।

'মিনিট তিনেক।'

'পাঁচ মিনিট পরও যদি মনিটরে আপনাকে দেখা না যায়, আমরা ধরে নেব আপনি পালাবার চেষ্টা করছেন,' বলল সোলায়মান। 'সেক্ষেত্রে স্পিয়ার গান থেকে পানির নিচে বর্শা ছোঁড়া হবে, গ্রেনেডও ফেলা হবে।'

কথা না বলে পানির নিচে ডুব দিল রানা।

নাইলন রশি অনুসরণ করে তিন মিনিটের মধ্যে সাবমেরিনের খোলা হ্যাচের সামনে নেমে এল রানা। রশির শেষ মাথার দিকে তাকাতেই দমে গেল মনটা। একটা নয়, চারটে ক্যামেরা ঝুলছে ওখানে–রশি পাক খেলেও যে-কোন একটা ক্যামেরা হ্যাচের দিকে তাক করা থাকবে। ওগুলোর সঙ্গে একটা করে আন্ডারওয়াটার টর্চও ফিট করা আছে, ফলে হ্যাচের মুখ ভেসে যাচ্ছে আলোয়।

সাবমেরিনে ঢোকার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ভেতরে না ঢুকে এখন যদি পালাতে চেষ্টা করে, সারফেস থেকে স্পিয়ার গান আর গ্রেনেড ব্যবহার করবে গেরিলারা। ছুটে আসা ঝাঁক ঝাঁক ধারাল বর্শা আর গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ছাতু বানিয়ে ফেলবে ওকে। তারচেয়ে ভেতরে ঢুকে আপাতত আত্মরক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পালাতে হলে অন্য কোন পথ দিয়ে বেরুতে হবে, কনিং টাওয়ারের হ্যাচ দিয়ে বেরুলে দেখে ফেলবে ওরা।

নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল আতঙ্কিত না হওয়ার ওপর ওর বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। প্রথমে সাবমেরিনটা পরীক্ষা করা দরকার, বেরুবার একটা পথ পেয়েও যেতে পারে। অবশ্য ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সাবমেরিন থেকে বেরুতে পারলেই যে শেষ রক্ষা হবে, তা নয়। ভেলাগুলো বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে পাহারা দিচ্ছে সারফেসে, মাথা তুললেই গেরিলারা দেখতে পাবে ওকে। মাথা তুলতে হবে বৃত্তের বাইরে, অনেক দূরে। বটলে অক্সিজেন আছে এক ঘণ্টা চলার মত। ধরা যাক বৃত্তের বাইরে বেরুতে আধ ঘণ্টার মত লাগবে ওর। এই হিসেবে, সাবমেরিন থেকে বেরুবার পথ করে নেয়ার জন্যে ওর হাতে সময় আছে সাতাশ মিনিটের মত।

সাবমেরিনটা বেশি বড় নয়। জেড ক্লাস সাবমেরিন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত। দু'পাশে অসংখ্য লিভার, টগল, হুইল, সুইচ, ট্যাংক, গজ ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছে রানা, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। খুদে মাছ ওগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনায়াসে আসা-যাওয়া করছে। ওকে দেখে হাড়ের একটা স্তূপ থেকে বেরিয়ে পালাল বড় সাইজের লাল একজোড়া কাঁকড়া। চোখে আরও কিছু একটা ধরা পড়ল, ফিন ছুঁড়ে হাড়গুলোর সরাসরি ওপরে চলে এল ও। আলো ফেলতেই চামড়ার একটা বেল্টে আটকানো

ছুরিটা দেখতে পেল। সেটা তুলে নিজের টুল বেল্টে গুঁজে রাখল।

বোমা খেয়ে ডুবেছে সাবমেরিনটা, গায়ে নিশ্চয়ই ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম কাজ সেটা খুঁজে বের করা।

বোর দিকে পাওয়া গেল সেটা। বো প্লেটের বেশ বড় একটা অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু রানার দুর্ভাগ্য, ক্ষত বা ফাঁকটা নিচের দিকে, প্রবালের একটা খণ্ড ভেতরে ঢুকে পড়েছে। নাহ্, এদিক দিয়ে বেরুনোর কোন উপায় নেই।

ন'টা বারো।

পুরো সাবমেরিনটা ঘুরে দেখল রানা। পাশ কাটাবার সময় নড়েচড়ে উঠল হাড়ের স্তূপ। ফাঁক খুঁজছে ও, সেই সঙ্গে টুলও। ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে কোন পথ দিয়ে বেরুতে হবে, কাজেই যন্ত্রপাতি দরকার।

ন'টা পনেরো।

একটা টুল লকার পাওয়া গেল, তারই সঙ্গে গ্রিজ-এর একটা ক্যান—ক্যানটা খোলা হয়নি। ক্রোবার আর স্টিলসনটা ওর কাজে লাগবে। পানির এতটা গভীরতায় হালকাই লাগল ওগুলো, বোর দিকে বয়ে আনতে তেমন কষ্ট হলো না। বোমাটা শুধু স্টিল প্লেট ছেঁড়েনি, অনেকটা জায়গা জুড়ে মুচড়েও দিয়েছে। ছেঁড়া অংশের কিনারাগুলো ক্ষুরের মত ধারাল, প্রবালের ভাজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে। জায়গাটা পার হয়ে গ্যালি আর স্লিপিং কোয়ার্টারের দিকে যাবার সময় শরীরের খানিকটা চামড়া হারাল রানা। টয়লেটটাকে পাশ কাটানোর সময় হাড়ের আরও কয়েকটা স্তূপ চোখে পড়ল।

কাত হয়ে পড়ে আছে সাব, বো টিউবগুলো তাক করা রয়েছে কার্নিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী তির্যক হয়ে। রানার দ্বিতীয় প্রার্থনাও পূরণ হলো না। চেয়েছিল টিউবগুলো খালি পাবে- কিন্তু ওগুলো লোড করা। চকচকে আলো-আঁধারির ভেতর টর্পেডোর প্রপেলারগুলো ওকে যেন বিদ্রূপ করছে। টিউবের ভেতর খাপে খাপে সেঁধিয়ে আছে টর্পেডো। নিরেটভাবে ঝালাই করা। লোনা পানিতে এত বছর থাকায় মরচে ধরে গেছে।

ন'টা বিশ।

প্রথম টিউবে কাজ শুরু করল রানা।

স্রেফ পণ্ডশ্রম। টিউবটা স্থানচ্যুত করতে হলে একটা চেইন হয়েস্ট দরকার, নিদেনপক্ষে একটা ডাবল ব্লক ও ট্যাকল। লোহার চুরুটটা টিউবের ভেতর ওয়েল্ড করা, ইস্পাতের সঙ্গে শক্তভাবে জোড়া লাগানো। অথচ অন্য কোন পথ খোলা নেই, টর্পেডো টিউব দিয়েই বেরুতে হবে ওকে।

ন'টা তেইশ।

কাজের গতি বাড়িয়ে দিল রানা। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে দ্বিতীয়বার সোলায়মানের হাতে ধরা পড়তে রাজি নয় ও। হয় টিউব সরাতে হবে, নাহয় টিউব থেকে টর্পেডো বের করতে হবে। কাজটা সম্ভব হলে বাঁচার একটা চেষ্টা করা যাবে। হ্যাচ দিয়ে বেরুনো আর আত্মহত্যা করা একই কথা। তারচেয়ে সাবের ভেতর অক্সিজেনের অভাবে মরা অনেক ভাল।

প্রথম টিউবের টর্পেডো নড়ছে না। প্রপেলার ধরে পিছন দিকে টানছে রানা।

শক্ত ডেকে পা বাধিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তিতে টানছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হলেও, আত্মরক্ষার ব্যাকুলতা আসুরিক শক্তি এনে দিয়েছে শরীরে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হচ্ছে না।

ন'টা পঁচিশ।

মাস্কের ভেতর পানি ঢুকেছে। চিৎ হয়ে মাথা ঝাঁকাল, পানি বের হতে মনোযোগ দিল দ্বিতীয় টিউবে। প্রপেলার যেন জ্যান্ত প্রাণী, চ্যালেঞ্জ করছে ওকে—টেনে দেখো পারো কিনা। হাত বাড়িয়ে ধরল রানা, টানছে, জানে কোন লাভ হবে না। ছোট একটা স্ক্রু খুলে এল মুঠোয়। সেটা ডেকে ফেলে দিয়ে বেল্ট থেকে ছুরিটা বের করল। টর্পেডোর পিছনে আঘাত করল প্রায় অন্ধ আক্রোশে, ঠিক যেখানে টিউবের গায়ে সেঁটে আছে ওটার ঢালু অংশ।

ছুরির ফলা যেখানে লাগল, জায়গাটা একেবারে লোহার মত শক্ত নয়। ফলাটা হড়কে টর্পেডোর ঢালু অংশ আর টিউবের ভেতর দিকের দেয়ালের মাঝখানে খোঁচা মেরেছে।

টর্পেডো টিউব থেকে আলাদা যদি করা সম্ভবও হয়, টেনে সেটাকে বের করবে কিভাবে? প্রপেলার তো ভেঙে গেছে। ধরার মত আর কিছু নেই।

ন'টা ছাব্বিশ।

নিজেকে রানা চার মিনিট বরাদ্দ করল, এর মধ্যে সাব থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে ভেলার তৈরি বৃত্ত পার হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় ওর হাতে থাকবে না।

ওই ফাঁকে আবার ছুরি চালাল রানা। টর্পেডোর গা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। প্রথম দিকে শক্তি যোগাল রাগ, শেষের দিকে আশা।

ছুরির ফলা টর্পেডোর গায়ে গর্ত তৈরি করছে। প্রতিবার সিকি ইঞ্চি। এ ইস্পাত হতে পারে না।

ন'টা সাতাশ।

টর্পেডোর বাঁট-এ আঘাত করল রানা। ওটার ধাতব শরীর চিরে গেল, নতুন ক্ষত নিস্প্রভ রূপোর মত চকচক করছে। প্ল্যাটিনাম! প্ল্যাটিনামের তৈরি টর্পেডো। একটা ডামি। বহুকাল আগে নিহত একজন জাপানী সাবমেরিন কমান্ডারের গোপন স্টোর হাউস।

দ্রুত সাঁতার কেটে এরইমধ্যে টুল লকারের দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে রানা। ছোট্ট এক প্রস্থ চেইনের কথা মনে পড়ে গেছে। ভালভ, লিভার আর হুইলগুলো ওকে থামাবার চেষ্টা করছে, দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। গ্রাহ্য না করে প্রতিটি বাধা পেরিয়ে আসছে রানা।

চেইন নিয়ে ফিরে এল আবার। সঙ্গে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর হাতুড়ি। টর্পেডোর ঢালু অংশে একটা ফুটো তৈরি করছে রানা। স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মেরে গর্ত তৈরি করতে হচ্ছে।

টর্পেডোর ঢালু গা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল। ছুরি দিয়ে গর্তটা চওড়া করতে হচ্ছে, তা না হলে চেইনটা ভেতরে গলানো যাবে না।

ন'টা পঁয়ত্রিশ।

গর্তের এক মুখ দিয়ে চেইন ঢুকিয়ে আরেক মুখ দিয়ে বের করে আনল, তারপর দুই প্রান্ত এক করে পিছন দিকে টান দিল। চেইনটা ছিঁড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তাই সাবধানে টানছে।

টর্পেডো কি একটু নড়ে উঠল? টিউবের দু'ধারের বাল্কহেডে পা বাধিয়ে ধীরে ধীরে টান বাড়াল রানা। আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করল—হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই, টর্পেডো সত্যি নড়ছে। সাফল্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখনই ওর ধৈর্যের পরীক্ষা। টান বাড়াবার প্রবল ইচ্ছাটা দমিয়ে রাখতে হলো।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে রানা। আবেগ ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ও। টিউব থেকে টর্পেডোর বেরিয়ে আসার মন্থর গতি নরকযন্ত্রণার মত অসহনীয় লাগছে।

তারপর হঠাৎই গতিটা বেড়ে গেল। একটু পরই টিউব থেকে হড়কে বেরিয়ে এল টর্পেডো। মেঝেতে সেটা একটা গড়ান দেয়া শেষ করেনি, টিউবে ঢোকার জন্যে লাফ দিল রানা। চওড়া কাঁধ আর পেশীবহুল বাহু বাধা হয়ে দাঁড়াতে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল। সুস্বাস্থ্য মৃত্যুর কারণ হলে তারচেয়ে বড় প্রহসন আর কি হতে পারে!

কিন্তু টিউবটা রানাকে নেবে না। বাহু জোড়া সামনে, হাত দুটো তীরের ফলার মত লম্বা করা, কিন্তু তাতেও শুধু কাঁধ পর্যন্ত ঢুকতে পারল টিউবে। জোরাজুরি করেও এগোনো যাচ্ছে না।

ট্যাংক! ওটাই টিউবে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে ওকে। টিউব থেকে মাথা বের করে পিঠ থেকে ট্যাংক খুলে হোস পাইপটা পরীক্ষা করল। ফ্লেক্সিবল হোস, টেনে লম্বা করা যায়। এই সময় মনে পড়ল—গ্রিজ!

সারা গায়ে গ্রিজ মাখল রানা। টিউবের ভেতরও খানিকটা ঢেলে দিল। এবার ট্যাংক ঢোকাল প্রথমে, লম্বা করা দু'হাতের মাঝখানে রাখল ওটাকে, মাস্কের ঠিক সামনে।

ন'টা চল্লিশ।

এগোতে পারছে রানা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে।

হাত দুটো টিউব থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বেরোল ট্যাংক। সবশেষে শরীরটা বেরিয়ে এল। ট্যাংকটা টেনে নিল রানা বুকে, এক হাতে জড়িয়ে রাখল শক্ত করে। পানির ওপর এখনি মাথা তোলার প্রশ্ন ওঠে না, প্রথমে ভেলার তৈরি বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। সাত থেকে বিশ ফুটের মত ওপরে উঠে ওই লেভেলেই থাকল, বৃত্ত থেকে বেরুবার জন্যে খোলা সাগরের দিকে না গিয়ে সৈকতের দিকে যাচ্ছে।

একই লেভেলে দীর্ঘক্ষণ থাকায় ডিকমপ্রেশনের জন্যে আলাদা করে কোন সময় দিতে হলো না। সাবমেরিন থেকে কতদূরে সরে এসেছে ওর কোন ধারণা নেই, তবে সোলায়মানের দেয়া ঘড়িতে দশটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। অর্থাৎ ট্যাংকের অক্সিজেন দশ মিনিট পর ফুরিয়ে যাবে।

ঘড়িতে চোখ রেখে রানা দেখল সারফেস থেকে দশ ফুট নিচে রয়েছে ও। সরাসরি তীরের দিকে এগোচ্ছিল এতক্ষণ, দিক বদলে সৈকতের সঙ্গে সমান্তরাল

একটা রেখা তৈরি করতে সাঁতার কাটছে এখন।

তারপর এক সময় ট্যাংকের অক্সিজেন ফুরিয়ে গেল, ঘড়িতে বাজে দশটা তিন। হোস সহ ট্যাংকটা ফেলে দিল রানা। মুখের মাস্কও। ভাল-মন্দ যা-ই ঘটুক, পানির ওপর ওকে এবার মাথা তুলতেই হবে।

সাত

পানির ওপর মাথা তুলে হাঁপাচ্ছে রানা। সৈকত থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে ও। জেটিটা দেখতে পাচ্ছে, প্রায় একশো গজ ডানে। চাঁদের আলোয় ভেলার তৈরি বৃত্তটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে কাছেরটা পঞ্চাশ গজ দূরে।

সাবধানে সাঁতার দিয়ে এগোল রানা, তীর যেদিকটায় জঙ্গলে ঢাকা।

ডাঙায় উঠে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তবে কান দুটো সজাগ। ভাগ্যগুণে এখনও বেঁচে আছে, ধরাও পড়েনি। মারাত্মক কোন ভুল করে না ফেললে এখন প্রাণ নিয়ে পালানো পানির মত সহজ। কিন্তু না, হাতের কাজ শেষ না করে পালিয়ে যাবার বান্দা মাসুদ রানা নয়।

ফিন দুটো খুলল রানা। ভেজা শর্টস ছাড়া পরনে কিছু নেই। অস্ত্র দরকার ওর। আর জুতো।

অস্পষ্টভাবে গেরিলাদের গলা শুনতে পাচ্ছে। ঘড়িতে এখন দশটা বাইশ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে গেরিলারা–হয় তাদের শত্রু মারা গেছে, নয়তো কোনভাবে পালিয়েছে। এত দূর থেকেও পানির ওপর টর্চের আলোর ছুটোছুটি লক্ষ করল রানা। ভেলাগুলো পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, বৃত্তটা বড় করছে ওরা।

জঙ্গলের আরও খানিকটা ভেতরে ঢুকল রানা। একটা ভেলা এদিকে রওনা হয়েছে। একজোড়া টর্চের আলো পড়ল জঙ্গলের কিনারায়। ঝোপের ভেতর শুয়ে পড়ল ও। ভেলাটা ফিরে গেল খানিক পর।

এগারোটা বাজল। বৃত্ত ভেঙে গেছে। এক এক করে জেটির দিকে ফিরছে ওগুলো।

সাড়ে এগারোটা। ভেলা তো নয়ই, এখন রাবার বোট দুটোও পানিতে নেই।

এবার রওনা হওয়া যায়। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সিধে হলো রানা। পানিতে ওকে না পাওয়ায় সোলায়মান নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে ও মারা গেছে, তা মনে করার কোন কারণ নেই। জঙ্গলে লোক পাঠাবে সে, বিশেষ করে তীর ঘেঁষা এলিফ্যান্ট ট্রেইলে। কাজেই চোখ-কান খোলা রেখে এগোতে হবে ওকে।

ঘুরপথে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে ও, কান পাতার জন্যে থামছে মাঝে মধ্যে। এক সময় মনে হলো ক্যাম্প বেশি দূরে নয়। ইতিমধ্যে দু'বার দিক বদল করেছে।

লোকটাকে দেখার আগে তার গলা পেল রানা। থাই ভাষায় গুনগুন করে গান

গাইছে। স্থির নয়, বোঝা গেল গলার আওয়াজ কমবেশি হওয়ায়। সম্ভবত একই জায়গায় ঘন ঘন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। বড় এক খণ্ড মেঘ ওটাকে ঢেকে না ফেললে সামনের ঝোপ ছাড়িয়ে এগোতে পারছে না রানা। লোকটাকে কাবু করতে হলে সময়ের হিসেবে কোন খুঁত থাকা চলবে না, কোন শব্দ করা যাবে না, তারপরও দরকার হবে ভাগ্যের সহায়তা।

মেঘ এল না, তবে লোকটা এল। রানা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে, না থামলে সেটার দু'ফিট পাশ দিয়ে চলে যাবে। তাই যাচ্ছে। তার পিছনে সিধে হলো ও, গানটা থামিয়ে দিল মাঝপথে লোহার মত শক্ত হাতে গলা চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি কম করল না, কিন্তু গলাটা ছাড়াতে না পেরে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল লোকটা।

লাশটা ধীরে ধীরে মাটিতে শোয়াল রানা। রাইফেলটা নিল না, শুধু ওয়েব বেল্টটা খুলে নিজের নগ্ন কোমরে জড়াল। আর নিল বেয়োনেটটা।

এখান থেকে ক্রল করে রওনা হলো রানা। হোলস্টার আর রিভলভারটা আমেরিকান। আর একজোড়া ওয়েবলি হ্যান্ডগ্রেনেড। রিভলভারটা বিশাল, ছোট একটা কামানই বলা যায়। শব্দ হয় এমন কোন অস্ত্র বাধ্য না হলে ব্যবহার করবে না ও। চেষ্টা করবে বেয়োনেট দিয়ে কাজ সারতে। জিনিসটা খুব একটা লম্বা নয়।

চাঁদের আলো পেলে এগোচ্ছে রানা, মেঘে ঢাকা পড়লে চুপচাপ শুয়ে থাকছে। দিনের বেলা দেখা ক্যাম্পটা স্মরণ করে এগোচ্ছে ও। দিক নির্ণয়ে ভুল না হয়ে থাকলে পিরামিড আকৃতির তাঁবু থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে ও। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তাঁবুর চারপাশে অবশ্যই গার্ড থাকবে।

দেশলাই জ্বালার আওয়াজ পেল রানা। ঝোপের আড়ালে, আগুনটা দেখতে পেল না। তবে পায়ের আওয়াজ পেল। ঝোপ ঘুরে রানার মাথার তিনফুট দূর দিয়ে চলে গেল গার্ড। ক্যাম্পের এত কাছাকাছি বাধ্য না হলে গার্ডদের কাউকে আক্রমণ করার ঝুঁকি না নেয়াই ভাল; একটু শব্দ হলেই গোটা ক্যাম্প জেগে উঠবে। লোকটার পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা।

আরও পনেরো মিনিট পর তাঁবুটা দেখতে পেল। কোথাও এতটুক ফাঁক না ফাঁক নেই, তবে খুবই অস্পষ্ট আভা বেরিয়ে আসছে সবুজ ক্যানভাস ভেদ করে। ভেতরে একটা ছায়া পায়চারি করছে, খুবই অস্থির। সোলায়মান এখন কি ভাবছে, প্রশ্নটা মনে জাগতেই হাসি পেল রানার, মশার কামড়ে ফুলে ওঠা মুখে ব্যথাও পেল। সাবমেরিনে সোনা আছে কিনা জানার জন্যে আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে, তাই এত অস্থির সে? নাকি রানা পালিয়েছে ভেবে?

ক্যাম্পটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মধ্যরাত পার হয়ে গেছে, গার্ডরা বাদে বাকি সব গেরিলাদের ঘুমোবারই কথা। কিন্তু রানা পানি থেকে উঠে না আসায় সোলায়মান কাউকে ঘুমোতে যাবার অনুমতি দেবে কি? মনে মনে একটা হিসাব করল ও। একশোর ওপর লোক আছে তার। পাঁচ জন করে দশটা দল গঠন করলেও পঞ্চাশজন হয়। একটা লোককে কাছাকাছি জঙ্গল থেকে খুঁজে বের করার জন্যে

পঞ্চাশজন যথেষ্ট। আরও দশজন না হয় ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। বাকি চল্লিশ বা পঞ্চাশজনকে ঘুমাতে না দেয়ার কোন কারণ নেই।

তাঁবু দেখতে পাবার পর রানার আর চাঁদের দরকার নেই। কিন্তু মেঘগুলো অসহযোগিতা শুরু করল। ছোট-বড় সবগুলো পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, চাঁদের সরাসরি নিচে আসছে না। ঘাসে মুখ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, জানে চোখ রাঙিয়ে বা অভিশাপ দিয়ে কোন লাভ হবে না। সম্ভবত ঘুমের মধ্যেই মাথার ওপর থেকে দু'একবার ডেকে উঠছে কয়েকটা বানর। গাছের ডাল দুলে ওঠার শব্দে বোঝা গেল দু'চারটে জেগেও আছে। ওরা রানাকে দেখতে পাচ্ছে, তবে এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেনি।

অবশেষে গাঢ় একটা মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। ক্রল করে তাঁবুর পিছনে চলে আসছে রানা। ভেতরে ছায়াটা এখন নড়ছে না। কোন শব্দও বেরুচ্ছে না। খাপ থেকে বেয়োনেটটা বের করল। একটাই কঠিন কাজ। ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে।

আঙুল দিয়ে তাঁবুর ক্যানভাস স্পর্শ করল রানা। তারপর চোখ বুজে স্মরণ করল তাঁবুর ভেতর কোথায় কি দেখেছে—ফিল্ড ডেস্ক, রেডিও, চেয়ার-টেবিল, কট, সব কিছু।

সোলায়মান যদি ডেস্কে বসে থাকে, ওর দিকে পিছন ফিরে আছে সে। কটে শুয়ে থাকলে তার পায়ের দিকে রয়েছে ও। বালিশগুলো কোনদিকে ছিল, স্পষ্ট মনে করতে পারছে। ঠিক বালিশ নয়, কম্বল মোড়া ন্যাপস্যাক। লণ্ঠনটা একটা পোলের গায়ে ঝুলছে, কটের কাছাকাছি। সোলায়মান হয়তো বই-টই পড়ছে। জেগেই আছে, তা না হলে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিত।

জেগে থাকলেও, ঝুঁকিটা নিতে হবে রানাকে।

বেয়োনেটের ডগাটা ক্যানভাসের গায়ে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে লাগল। মনে মনে নিজেকে সাবধান করে দিচ্ছে, আরও সাবধানে, আরও ধীরে।

ক্যানভাস এক ইঞ্চি চিরে গেল। বেয়োনেটের ডগা দিয়ে চেরা অংশটা ফাঁক করে একটা চোখ রাখল তাতে। ওর দিকে পিছন ফিরে ফিল্ড ডেস্কে বসে রয়েছে দাতো সোলায়মান। মোটা একটা খাতায় কি যেন লিখছে সে। অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে জঙ্গল এতটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কাগজের ওপর কলম চালাবার খসখসে আওয়াজটাও পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

রানার জিনিস-পত্র সোলায়মানের ডেস্কে ছড়ানো রয়েছে। ওয়ালথারটা তার ডান হাতের কাছাকাছি। খাপে ভরা স্টিলেটোটা বাম দিকে। ম্যাশেটিটাও। শুধু এ-কে/ফরটিসেভেনটা নেই।

নড়ে উঠল সোলায়মান, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শূন্যে তাকিয়ে মাথা চুলকাল।

যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এবার কাজ শুরু করতে হয়। বিশ গজ পিছিয়ে এল রানা, শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল একটা উঁচু গাছের মাথা লক্ষ্য করে। গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ শুনে সন্তুষ্ট বোধ করল রানা, সরাসরি কোন বানরকে লেগেছে। পরমুহূর্তে নরক গুলজার হয়ে উঠল। শুধু এই একটা গাছের নয়, আশপাশে যত গাছে ওগুলো আছে সব একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে। এখন আর রানার পিছন ফেরার উপায় নেই। চাঁদকে মেঘের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল ও। এবার আশাটা পূরণও হলো। এক ছুটে তাঁবুর কাছে ফিরে এল ও। চেরা অংশটা বেয়োনেটের ডগা দিয়ে ফাঁক করে সোলায়মানের দিকে তাকাল। আড়ষ্ট ও সতর্ক হয়ে উঠেছে সে, মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করা, বানরগুলোর চেঁচামেচি শুনছে। এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এক হাজার একটা কারণে ওগুলো শোর তুলতে পারে। সে ভয় পায়নি বা আতঙ্কিত হয়নি, কেবল চমকে উঠেছে।

সাবধানে বেয়োনেট দিয়ে তাঁবু কাটল রানা, এক গজ লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া ফালি দরকার ওর। ফালিটা হাতে নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকে সিধে হলো। সোলায়মান আবার তার কাজে মন দিয়েছে, কানে বানরের চিৎকার ছাড়া অন্য কোন শব্দ ঢুকছে না। ধীরে ধীরে তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। বৈশাখির শেষ পরিণতির দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ক্যানভাস লূপটা সোলায়মানের গলায় পরিয়েই হ্যাঁচকা টান দিল রানা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো একহারা শরীরটা। গলার মাংস কেটে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ক্যানভাসের ফালি। চেয়ার সহ তাকে পিছিয়ে আনল ও, পা দুটো যাতে ডেস্কে বাড়ি মারতে না পারে।

সোলায়মান জানতেই পারল না কে তাকে খুন করছে। ঝাঁকি খেয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে, হাত দিয়ে গলা থেকে ক্যানভাসের ফালিটা ছাড়াবারও চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

লাশটা চেয়ার থেকে তুলে ডেস্কের তলায় ঠেলে দিল রানা। চেয়ারটা যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রাখল। তাঁবুর দরজার দিকে চোখ, এক হাতে বেয়োনেট, সরে এসে রেডিওটা অন করল ও। এমআই-র কোটা বারু ব্রাঞ্চের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী ওর জানা আছে। অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এক মিনিট লাগল। পাশাকে চাইল রানা, কিন্তু সে অফিসে নেই। লিখে নিতে বলে তাকে একটা মেসেজ দিল ও। প্রথমেই জানাল, 'সাকার আবদুল্লা পচে গেছে, কাজেই এই মেসেজ সম্পর্কে তাকে কিছু জানানো যাবে না।' তারপর এখানকার লোকেশন সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে বলল, 'আজিজ পাশার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, বলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামরিক হেলিকপ্টার পাঠাতে হবে।' গেরিলাদের সংখ্যা সম্পর্কেও একটা ধারণা দিল ও। সবশেষে বলল, 'আমি তিন নম্বর হাইওয়ের দিকে যাচ্ছি।'

রেডিও বন্ধ করে সিধে হতে যাচ্ছে, ফ্ল্যাপ সরিয়ে তাঁবুতে ঢুকল ডেবাঙ। ভেতরে ঢুকে ডেস্ক আর চেয়ারের দিকেই প্রথমে তাকাল সে। পরমুহূর্তে ঝট করে রানার দিকে। রানা তাকে কোন সময়ই দিল না, হাতের বেয়োনেটটা ছুঁড়ল।

মেরেছিল বুকে, লাগল গলায়, ঠিক চিবুকের নিচে। ভোকাল কর্ডটা দু'ভাগ হয়ে গেল, কিন্তু সাথে সাথে মারা গেল না। ভাঁজ হওয়া হাঁটু মাটিতে ঠেকল, শরীরটা টলছে, এক হাতে বেয়োনেট ধরে টানছে। অপর হাতটা হোলস্টারে পৌঁছেছে, কিন্তু পিস্তলটা পেয়েও মুঠোয় ধরার শক্তি পাচ্ছে না।

ছুটে এসে তার মুখে কষে একটা লাথি মারল রানা। মেঝেতে শুয়ে পড়ল ডেবাঙ। ঝুঁকে তার মাথার চুল ধরল ও, বেয়োনেটের হাতল ধরে টান দিল। মাথার ওপর তুলে গলার ক্ষতের ওপর আবার নামাল ওটা।

বানরগুলো এখনও চেঁচাচ্ছে।

ডেস্ক থেকে নিজের জিনিসগুলো নিল রানা—ওয়ালথার, স্টিলেটো, ম্যাশেটি, কমপাস। আর নিল খাতাটা। এমআই-র কাজে লাগবে ওটা।

ডেবাঙের জুতো জোড়া খুলে নিল রানা। ওর পায়ের তুলনায় ছোট, তবে বেয়োনেট দিয়ে চিরে নেয়ায় পা ঢোকাতে অসুবিধে হলো না।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসার পর বানরগুলো আরও জোরে ডাকাডাকি শুরু করল। সঙ্গে টর্চ রয়েছে, কিন্তু জ্বালতে সাহস হলো না। চাঁদটাও মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে আবার। অন্ধকারে সাবধানে হাঁটছে রানা।

তিন নম্বর হাইওয়েতে পৌঁছুতে ভোর হয়ে যাবে।

রেডিও অপারেটর সাকার আবদুল্লার লোক না হলে মেসেজটা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে পাশার কাছে। রেডিও-টেলিফোনের মাধ্যমে এই এলাকার কাছাকাছি সামরিক ঘাঁটিতে খবর পৌঁছে দিতে খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে তার। হেলিকপ্টার ফুয়েল ভরা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবে ওগুলো। সার্চলাইটের আলো ফেলে জেটি আর সৈকত খুঁজে নেয়া পাইলটের জন্যে কোন সমস্যাই নয়।

রানার একবার ইচ্ছে হলো একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে অন্তত আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে। হেলিকপ্টারের আওয়াজটা ওর কানে মধুবর্ষণ করবে। কিন্তু না, সেটা বোকামি হয়ে যাবে। সৈন্যরা পৌঁছালে কি ঘটবে, কল্পনা করা কঠিন নয়। গেরিলারা প্রথমে হয়তো প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, কিন্তু তারপরই পালাবার জন্যে ছড়িয়ে পড়বে জঙ্গলের চারদিকে। তখন নিজেকে লুকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। তারচেয়ে সময় থাকতে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়াটাই নিরাপদ।

সাবধানে, চোখ-কান খোলা রেখে, যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছে রানা। এটা ওর ব্যক্তিগত একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, তাতে সম্পূর্ণ সফলও হয়েছে ও, কিন্তু তবু কোন উল্লাস বা আনন্দ নেই মনে। প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হলেও, প্রিয় বন্ধু আবু রাশেদকে কোনদিন আর ফিরে পাবে না ও। ব্যাপারটা ওর কাছে একটা চোখ বা হাত হারাবার মত অপূরণীয় ক্ষতি।

আর বৈশাখি মেয়েটা ওকে চিরস্থায়ী একটা বেদনা উপহার দিয়ে গেছে। তার কথা যখনই মনে পড়বে, টনটনে একটা ব্যথা অনুভব করবে রানা। এখন যেমন করছে। সেই সঙ্গে একটা অপরাধবোধও থাকবে। ও-ই তো মেয়েটাকে সঙ্গে করে এত দূর নিয়ে এসেছিল। অথচ বাঁচাতে পারেনি। কথাটা ঠিক—সেই মুহূর্তে অসহায় ছিল ও, তবু প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না কার ওপর।

আর মাত্র দুটো কাজ বাকি আছে রানার।

সর্পমন্দিরের নিচে বা আশপাশে প্ল্যাটিনামের খনি থাকতে পারে, এই সম্ভাবনার কথাটা মালয়েশিয়া সরকারকে জানানো। এটা আসলে দ্বিতীয় কাজ,

পরে করা যাবে। প্রথম কাজ হলো হাইওয়েতে পৌছে মালয়েশিয়ান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার দেখতে পেলে সোলায়মানের ক্যাম্পে ফিরে আসবে ও। বন্দী গেরিলাদের জেরা করলে অ্যালান বোর্ডারের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পেতে অসুবিধে হবে না। বোর্ডারকে সোলায়মানের নামে একটা মেসেজ পাঠাবে ও—'মাসুদ রানাকে বন্দী করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।'

ডাইভার তো পাঠাবারই কথা, তাদের সঙ্গে বোর্ডার নিজেও চলে আসতে পারে। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সিআইএ-র কোন কর্মকর্তা যদি মালয়েশিয়ান জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে যায়, কার কি বলার থাকতে পারে!

***